আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক ১৮৫

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৮৫ তম সংখ্যা জুলাই'১৬
শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরী

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

খুশীর বার্তা নিয়ে আবারো এসেছে ঈদ- - ০৩

ঈদের মাসায়েল---------- - ০৭

হাদীস দ্বারা কিয়ামের প্রমাণ এবং ওহাবীদের দলীল খন্ডন---------- - ০৮

দরূদ শরীফের অনন্য গ্রন্থ : মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-------- - ১৭

রহস্যে ভরপুর পবিত্র কোরআন শরীফ- -২১

ধৈর্যের প্রতীক হযরত যয়নব বিনতে ফাতেমা (রাঃ আন্হা)---------- -২৭

আল কুরআনের জীবন্ত কাহিনী-------- -২৯

হযরত শাহ জালাল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)-এর সঙ্গী ৩৬০ আউলিয়াদের নামের তালিকা---------- -৩১

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক- 12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আবদুর রব
মা নীড়, ১৩২/৩, আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৭২৭৫১০৭, মোবাইল: ০১৭২০ ৯০৬ ৯৯৬

সম্পাদকীয়

06 Avlvp 1423 ❖ 16 kvlqvj 1437 ❖ 21 RyjvB 2016

ঈদ মোবারক - ঈদ মোবারক

ঈদ উত্তর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সুন্নীবার্তার পাঠক, গ্রাহক, এজেন্সী, সুন্নী মোবাল্লিগ, উপদেষ্টা এবং সহযোগী পরিষদকে। ঈদ মুসলিম সমাজের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। এই দিনে লক্ষ লক্ষ পাপী মুসলমানকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দু:খের বিষয় হল - আমাদের সমাজে ঈদ মানে কিছু মানুষ মনে করে নতুন কাপড় পড়ে ঘুরাঘুরি করা। আমাদের জানতে হবে কেবল নতুন জামা কাপড় পড়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া কিংবা বেপর্দা ঘুরাফেরা করার নাম ঈদ নয়। আসলে ঈদের দিন শরিয়ত নির্ধারিত কিছু ইবাদত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন খোলা ময়দানে সমবেত হয়ে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, আশরাফ-আতরাফ সকলে একই কাতারে ঈমামের পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সাথে দু'রাকাত নামায আদায় করতে হয়। এই নামাজের মাধ্যমে ইসলামী ঐক্য, সামাজিক, আত্মিক এবং ইসলামী শক্তির পরিস্ফুটন ঘটে এবং ভ্রাতিত্ব বন্ধন মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ঈদ অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আনন্দ উৎসব করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। ইসলাম এই সহজাত প্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে ঈদ উৎসবের অনুমতি প্রদান করেছে।

পূর্ণ এক মাসের সংযম সাধনার পর, অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শুকরিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঈদ উৎসবের মাধ্যমে। এক মাসের দীর্ঘ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষনা করা হয় ঈদের দিনে। এজন্য এদিনকে বলা হয় "ইয়াওমুল জায়েজাহ" বা প্রতিদান ও পুরস্কার দিবস। বলতে পারি ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষিত মহান পুরস্কার লাভের দিবস হলো পবিত্র ঈদের দিন।

আমরা যদি গবেষণা করে দেখি, এই ঈদের দিনে অর্ধপৃথিবীর শাসক হযরত ওমর (রা.) ঘরের দরজা বন্ধ করে অঝোর নয়নে কাদঁছেন এবং ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন দিনটি।

সুতরাং আসুন আমরা নিজের পাপের মার্জনা এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি অর্জনের জন্য এই দিনটি ইবাদত বান্দেগীর মাধ্যমে কাটাই। মুসলমানদের জীবন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানই আল্লাহর দরবারে নিবেদিত। কাজেই কামনা করছি আনন্দ এবং কল্যাণময় হোক সকলের জন্য এই ঈদ।

আমিন !

www.sunnibarta.com

খুশীর বার্তা নিয়ে আবারো এসেছে ঈদ

মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

ঈদ আমাদের সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক কোন উৎসব নয়। সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে ঈদ মুসলিম সমাজের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই অনুধাবনকে মূল্যায়ন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্বও বটে। দীর্ঘ একমাস সীয়াম সাধানার পর মহান আল্লাহর পক্ষ হতে পুরস্কার এই ঈদুল ফিতর। ঈদের দিবস মুসলিম মিল্লাতের পুরস্কারের দিবস, সফলতার দিবস, মুক্তির দিবস। অভিবাধনের দিবস, ক্ষমার দিবস, নেয়ামত প্রাপ্তির দিবস। যাবতীয় পুরস্কার তারই জন্য, যে নিজের আত্মাকে পরিস্কার করতে পেরেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)

অর্থাৎ- "সফল হয়েছে সে, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে এবং স্বীয় প্রভূর স্মরণ করেছে অতঃপর নামাজ পড়েছে"। (সূরা আ'লা আয়াত ১৪, ১৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈদের দিন আগমন করার সঙ্গে সঙ্গে আসমান হতে ফেরেশতারা দুনিয়াতে নেমে আসে আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে অবস্থান নেয় এবং ডাক দিয়ে বলে- হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত তোমারা দয়াল প্রভূর দরবারে এসে হাজির হও তোমরা বেরিয়ে পড়ো ! তিনি তোমাদেরকে পুরস্কার দিবেন এবং বড় বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর বান্দারা যখন ঈদের নামাজের ময়দানে কিংবা মসজিদে হাজির হয় তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন- ফেরেশতারা আমার এই বান্দাদের পুরস্কার কী হতে পারে? ফেরেশতারা বলে ওহে মালিক ! আপনি তাদের মাফ করে দিন। এক পর্যায়ে আল্লাহ পাক বলতে থাকেন ওহে বান্দারা তোমরা আমার কাছে চাও। আমি আমার জাতের কসম করে বলছি। তোমরা আজকের এই সমাবেশে যদি পরকালের জন্য কিছু চাও তা অবশ্যই আমি দিয়ে দিব আর যদি পার্থিব কোন বিষয় চাও তাহলে সে বিষয়ে আমি বিবেচনা করব (তা তোমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে কিনা)। তোমরা নিস্পাপ হয়েই ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সুন্তুষ্ট করেছ আমি তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। (বায়হাকী শরীফ)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- একদল লোক ঈদের ময়দান হতে ফিরে আসার সময় নবজাত শিশুর মত নিস্পাপ হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর অপর বর্ণনায় এসেছে- নবীজি ইরশাদ করেন বান্দা যখন একমাস রোযা রেখে ঈদের ময়দানে যায় তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বলেন- সকল কর্মচারী কাজ শেষে তার পাওনা আবেদন করে আর আমার বান্দারা দীর্ঘ একমাস রোযা পালন করল আর এখন ঈদের ময়দানে এসে পুরস্কারের আবেদন জানাচ্ছে। তোমরা সাক্ষী থেকো। আমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অতঃপর এক ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলবে - হে উম্মতে মুহাম্মাদী ! তোমরা এবার ঘরে চলে যাও আজ তোমাদের নাম সমূহ সওয়াবে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- হে আমার বান্দারা তোমরা আমার উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছ এবং আমার উদ্দেশ্যে ইফতার করেছ সুতরাং আজ তোমরা নিস্পাপ হয়েই ফিরে যাও।

'তানবীহুল গাফেলীন, কিতাব বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে - নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা রমজানের শুরু হতে লাইলাতুল কদর পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে ষাট হাজার করে নিশ্চিত জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। আর এ পর্যন্ত যত জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে সমপরিমান জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয় 'লাইলাতুল কদর, তথা কদরের রাত্রিতে। আর রমজানের শুরু থেকে কদর পর্যন্ত এবং কদর রাত্রিতে যত জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে- তত পরিমান জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয় " ঈদুল ফিতর" এর দিনে।

উপরোক্ত হাদীস শরীফের আলোকে স্পষ্ট বুঝা গেল ঈদের দিবস কেবল আমোদ প্রমোদের দিবস নয় - বরং ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষিত মহান পুরস্কার লাভের দিবস।

www.sunnibarta.com

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ঃ-

মহান আল্লাহ মাহে রমজানের রমহত, মাগফিরাত এবং নাজাতের পুরস্কার প্রদানের পর আবার যারা দীর্ঘ একমাস সিয়াম পালনের পর ঈদের ময়দানে গিয়ে নামাজ আদায় করবে তাদের জন্য সাধরণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পবিত্র হাদীস শরীফের বর্ণনায় ঈদের পূর্ববতী রাতকে "লাইলাতুল জায়িযাহ" বা পুরস্কারের রাত বলা হয়েছে।

অপর এক হাদীসে রয়েছে- নবীজি ইরশাদ করেছেন - যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে সওয়াব লাভের নিয়তে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী করে, কেয়ামতের দিন তার হৃদয় মরবে না যে দিন মানুষের হৃদয় মরে যাবে। (ইবনে মাজাহ)

ইবলিশ শয়তানের অবস্থা ঃ

ঈদের উপুর্যপুরী পুরস্কার প্রদানে মহান আল্লাহ তায়ালা খুশী, ফেরশতারাও খুশী। আর বান্দাতো খুশীর সাগরে নিমজ্জিত। যখন চতুর্দিতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে- তখনই বিচলিত ও অত্যন্ত অস্থির দেখা যায় ইবলিশ শয়তানকে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রঃ) {তাবেয়ী} বলেছেন-

"যখন ঈদ আগমন করে, তখন ইবলিশ শয়তান চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকে। তার এই করুণ অবস্থা দেখে অন্যান্য অনুসারী শয়তানরা তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে জিজ্ঞাসা করে- কি ব্যাপার? আপনি আমাদের নেতা, আজকে আপনি এত দুঃখিত ও অস্থির কেন? তখন সে বলে- হায় আফসোস! সারা বৎসর যাদেরকে আমরা বিভিন্ন ভাবে প্ররোচনা কুমন্ত্রনা ইত্যাদি দিয়ে বহু ধরনের গুনাহে লিপ্ত করেছিলাম, আজকের এই দিনে আল্লাহ তাদের পাহাড়সম সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। তবে এতে হতাশ হলে চলবে না। তোমরা তাদেরকে আবারও প্রবৃত্তির কামনায় ও তৃপ্তিতে মশগুল করে দাও। (মুকাশাফাতুল কুলুব)

মূলতঃ শয়তান দীর্ঘ একমাস বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে আরো দ্বীগুন উত্তেজনা নিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করার নানান কৌশল নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে এবং এতে তারা ও এক শ্রেণীর লোক বিশেষ করে তরুন তরুনীদেরকে বাগে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত করে আনন্দ উপভোগ করে। আর নতুন প্রজন্মের তরুন তরুনীরা মনে করে - এটাই ঈদ। আমাদেরকে জানতে হবে কেবল নতুন জামা কাপড় পড়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া কিংবা বেপর্দা ঘুরাফেরা করার নাম ঈদ নয়। ঈদ তাদের জন্য - যারা সত্যিকার অর্থে রোযা রেখেছে, ইবাদত বন্দেগী করেছে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেছে তারাবীর নামাজ পড়েছে তাহাজ্জুদ পড়েছে। অথচ, আজকের সমাজে দেখা যায় ঈদের আমেজ তাদের মধ্যে যারা অন্যান্য নফল ইবাদত দূরে থাক- ফরজ রোজাগুলোও ঠিকমতো আদায় করেনা।

হযরত ওমর (রাঃ) এর ঈদ ঃ

ঈদুল ফিতরের দিন কেবল আনন্দের নয়- বরং অনেকের জন্য বেদনারও বটে। বড় বড় মনিষিরা তা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)'র ঘরে ঈদের দিন লোকেরা হাজির হয়ে দেখতে পেলেন- তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে আঝোর নয়নে কাদঁছেন। লোকেরা হতভম্ব হয়ে জানতে চাইলেন- হে আমিরুল মুমিনীন, আজকে আমাদের খুশির দিন। আজ ঈদের দিন। কিন্তু আপনি কাদঁছেন কেন? রহস্যটা কি- আমাদেরকে কি খুলে বলবেন? জবাবে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন- আজকের দিনটা যেমন খুশির দিন - তেমনি দু:খের দিনও। যাদের রোযা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে- তাদের জন্য আজকের দিন খুশীর দিন। কিন্তু যাদের নামাজ রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি বরং প্রত্যাখ্যান হয়েছে- তাদের জন্য আজ দু:খের দিন। এটা তাক্ওয়া। আমি জানিনা আল্লাহ আমাকে কোন দলে রেখেছেন।

আকাশের নক্ষত্রের চাইতে বেশী সংখ্যক ইবাদত যার- তিনি হলেন হযরত ওমর ফারুক (রা:)। আর সেই মহান ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিনে কান্নাকাটি করলে আমাদের কী করা উচিত দু:খজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আছে- আমল ও ইবাদতের অহংকারে তাদের সামনে দাঁড়ানোও মুশকিল। কথায় কথায় আমল- এর বায়ান ও আমলের গর্ব। হযরত ওমর ফারুক (রা:) এর চরিত্র হতে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

কেবল নতুন পোশাক পরিধানের নাম ঈদ নয় সারাটি মাস নামাজ রোযা ইবাদত বন্দেগীর ধারে কাছেও নেই- অথচ ঈদের দিন ঝকঝকে নতুন পোষাক পরিধান করলাম। এতে কোন সার্থকতা নেই। কেবল নতুন পোষাক পরিধানের নাম ঈদ নয়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদা তার শাহজাদাকে ঈদের দিবসে পুরাতন পোষাক পরিধান অবস্থায় দেখে কেঁদে ফেললেন। শাহজাদা জিজ্ঞাসা করলেন- আব্বু ! আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে খলিফা বললেন, আজ ঈদের দিন অন্যান্য ছেলেরা নতুন নতুন পোষাক পরবে- আর তোমার গায়ে পুরাতন কাপড় ; এতে করে আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমার মনটা ভেঙ্গে যাবে। উত্তরে শাহজাদা বললেন, মনতো তারই ভাঙ্গবে- যে আল্লাহর সন্তুটি পর্যন্ত পৌছাঁতে পারেনি। আমি আশা করছি যে, আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। ছোট ছেলের মুখে তাৎপর্যপূর্ণ কথা শুনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) খুশী হলেন এবং শাহজাদাকে জড়িয়ে ধরে অনেক দোয়া করলেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব)

ঈদুল ফিতরের আধ্যাত্বিক গুরুত্ব :-

ঈদ কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর রয়েছে আধ্যাত্বিক শিক্ষা। এই ঈদের আনন্দ আর দশটি আনন্দের সাথে তুলনা হয়না। এই আনন্দ অজানাকে জানার, পরম আকাংখার বস্তুকে পাওয়ার, তথা দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর নিজের নফস জালিয়ে পড়িয়ে একেবারে সোজা করার পর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আনন্দ। সর্বোপরি - এই ঈদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সোপানও বটে। পবিত্র হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- রোযাদারের জন্য দুটি খুশী- একটি রোযা শেষে ইফতার বা ঈদুল ফিতরের আনন্দ, আর একটি হলো আত্মা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে স্বীয় প্রভূর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের আনন্দ।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব :-

ঈদের দিনে সম্পদের পরিমাণ নেসাব পরিমান হলেই তাকে সদকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। আর ঐ সম্পদ এক বৎসর পূর্ণ হলে যাকাত প্রদান করতে হয়। এটাই পার্থক্য সদকাতুল ফিতর পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ হতে আদায় করতে হয়। আর এই ফিতরার টাকাগুলো পাবে সমাজের হৃত দরিদ্র গরীব মিসকীনরা। এতে করে দারিদ্র্য বিমোচনের একটা পথ সুগম হয়। ইসলামে সদকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব ঘোষনা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন- যেন মক্কা - মুয়াজ্জামার অলিগলিতে এ কথা ঘোষণা করে দেয় "সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব"। তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)। এটা ইসলামী অর্থনীতির একটি মজবুত খাত। গরীব মিছকিনদের জন্য এটা ব্যয়িত হয়।

ঈদের ময়দানে যাওয়ার পূর্বেই ফিতরার টাকা গরীব মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার তাকিদ এসেছে হাদীস শরীফে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যতক্ষন সদকাতুল ফিতর আদায় করা না হয়, ততক্ষণ বান্দার রোযা আসমান যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায়। (কানযুল ওম্মাল ৮ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)।

হযরত মাওলা আলী (রাঃ) এর দানশীলতা:-

একদা কোন এক ভিখারী কাফিরদের নিকট ভিক্ষা চাইলে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপস্বরূপ হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দিলো। কারণ তারা জানত যে, ঐ মুহূর্তে হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট কোন টাকা ছিলনা। এতে করে তিনি তাদের সামনে লজ্জিত ও ছোট হবেন। ভিক্ষুক মাওলা আলীর (রাঃ) কাছে এসে তার ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলে তিনি দশবার দরূদ শরীফ পড়ে ভিক্ষুকের হাতের তালুতে দম করে দিয়ে বললেন- মুষ্টি বন্ধ করে নাও- আর যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খোল। এদিকে কাফিররা হাসির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। কারণ - তাদের ধারণা- খালি হাতে ফুঁ দিলে কী হবে? কিন্তু দরূদ শরীফের কী বরকত ! ভিখারী যখন তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খোলল - তখন দেখা গেল হাতের ভিতরে স্বর্ণের দীনারে ভর্তি। দরূদ শরীফের এই বরকত এবং মাওলা আলীর করামত দেখে সেখানকার অনেক কাফিরই মুসলামন হয়ে গেল।

ঈদের নামাজের পূর্বে ফিতরা আদায় করলে দশটি পুরস্কার :-

অপর এক হাদীসে রয়েছে- নবীজি ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি ফিতরা আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে দশটি

www.sunnibarta.com

পুরস্কার (১) তার দেহ গুনাহমুক্ত হয়ে যাবে, (২) জাহান্নামের আযাব হতে মুক্তি পাবে, (৩) তার রোযা কবুল হবে, (৪) বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যাবে, (৫) কবর হতে সে নিরাপদে ওঠবে (৬) যত ভাল আমল করবে সব কবুল করা হবে (৭) কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হবে, (৮) পুলসিরাত বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করবে, (৯) আমলের পাল্লাকে সওয়াব দিয়ে ভারী করে দেয়া হবে, (১০) হতভাগাদের তালিকায় নাম থাকলে আল্লাহ তায়ালা সেখান থেকে তার নাম মুছে দিবেন। (সূত্র ঃ শেখ জাদাহ হাশিয়া তাফসীরে বায়জাভী)।

উপসংহার ঃ

সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন-এর বিবেচনায় পবিত্র ঈদুল ফিতর মুসলিম জাতির জন্য এক মহা নেয়ামত- জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তির অন্যতম সোপান। মাহে রমজানে যেভাবে একজন মুসমান নির্দিষ্ট কতিপয় নীতিমালা মেনে চলেন- ঈদ পরবর্তী সময়েও যদি ঠিক সেভাবে ইসলামের দিক নির্দেশনা মেনে চলতে পারেন, তাহলে তার ব্যক্তি জীবন ধন্য হতে বাধ্য। পাশাপাশি তার সমাজ জীবনেও পড়বে এর সুন্দর প্রভাব। পর্যায়ক্রমে তার প্রভাব গিয়ে পড়বে রাষ্ট্রের উপর। আসুন, আমরা ঈদের আনন্দকে কেবল একদিনের ভিতরে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দেই প্রতিটি ঘরে ঘরে বছরের প্রতিটি দিনে। তাহলে সার্বিক ক্ষেত্রে মুক্তি ও সফলতা আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। সার্থক হবে আমাদের ঈদ উৎসব। আল্লাহই একমাত্র তাওফিক দাতা।

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে ভর্তি চলছে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৫ বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।
[২০১৫ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

ভর্তি চলছে

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

ঈদের মাসায়েল

সুন্নি বার্তা গবেষনা কেন্দ্র

১। ঈদের নামায তাদের উপর ওয়াজিব- যাদের ওপর জুময়া ওয়াজিব (কাজী খান)।

২। জুমার খুতবা নামাযের পূর্বে দিতে হবে- উহা ওয়াজিব। কিন্তু ঈদের খুতবা নামাযের পরে এবং ইহা সুন্নাত। (ঐ)

৩। জুমার খুতবা না পড়লে নামায জায়েয হবেনা কিন্তু ঈদের নামায হয়ে যাবে। তবে সুন্নাত তরকের গুনাহ হবে। (ঐ)

৪। জুমার খুতবার পূর্বে মিম্বারে বসা সুন্নাত- কিন্তু ঈদের খুতবায় বসা সুন্নাত (আইনী ও আলমগীর)।

৫। জুমার পূর্বে আযান ও ইকামত আছে- কিন্তু দুই ঈদে আযান ও ইকামত নেই (কাজীখান)।

৬। ঈদের প্রথম খুতবার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুতবার পূর্বে ৭ বার তাকবীরে তাশরীক বলা মোস্তাহাব (আলমগীরী)।

৭। ঈদের অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত- কিন্তু জানাযার তাকবীর সমূহে হাত না উঠানো সুন্নাত (আলমগীরী)।

৮। ঈদুল ফিতরের প্রথম খুতবায় সাদকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিব, কখন ওয়াজিব, কি পরিমান ওয়াজিব, কাকে দেয়া যাবে, কি দিয়ে ফিতরা দিতে হবে - এই পাঁচটি বিষয় উল্লেখ থাকা উত্তম (আলমগীরী ও জাওহারায়ে নাইয়ারাহ্)।

৯। মহিলাদের জন্য জুমা ও ঈদ ওয়াজিব নয় এবং পাশে.... তবে বৃদ্ধা মহিলারা শুধু ইশা ও ফজরের জামাতে ইচ্ছা করলে শরিক হওয়া জায়েয। যুবতী মহিলারা কোন জামাতেই শামিল হতে পারবে না। (কাজীখান)।

১০। নিম্মের কাজগুলো রোযার ঈদের দিন মোস্তাহাব। ক) হাত পায়ের নখ কাটা (খ) মেছওয়াক করা (গ) গোসল করা (ঘ) নতুন বা পুরাতন উত্তম পোষাক পরিধান করা (ঙ) খুশবু ব্যবহার করা (চ) চুপে চুপে তাকবীরে তাশরীফ পাঠ করে রাস্তা চলা (ছ) আসা যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা (জ) যথাসম্ভব পায়ে হেটে যাওয়া (ঝ) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তিন, পাঁচ, সাত- বেজোড় সংখ্যায় খুরমা খাওয়া। না পেলে যে কোন মিষ্টি জাতীয় খাদ্য বা শিরনী খাওয়া (ঞ) কোরবানীর ঈদে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া উত্তম। তবে খেলে দোষনীয় বা মাকরূহ হবেনা। (ট) কোরবানী দাতাগণের প্রথম খাদ্য গোস্ত দিয়ে উত্তম (আইনী)।

১১। সূর্য উদয়ের পর সাদা রং ধারণ করলে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং ঠিক দুপুরের আগ পর্যন্ত পড়া যায়। (আলমগীরী ও সিরাজিয়া)

১২। উত্তম হলো - ঈদুল ফিতর নামায কিছু বিলম্ব করে পড়া এবং কোরবানী ঈদের নামায শীঘ্র শীঘ্র আদায় করা (আলমগীরী ও খোলাছা)।

১৩। দুই ঈদে ও জুমাতে সাহু সিজদা দিতে হবে না কেননা এতে মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হবে (কাজীখান)।

১৪। **নামাযের নিয়ত** ঃ নাওয়াতু আন উয়াল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকাআতাই ছালাতি ঈদিল ফিতরি মা আ ছিত্তি তাকবীরাতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়ালা ইক্বতাদাইতু বিহাযাল ইমাম মুতাওয়াজ জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারিফাতি আল্লাহ আকবার।

বাংলা ঃ আমি অতিরিক্ত ছয় তাকরীরের সাথে কেবলা মুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে দুই রাকাআত ওয়াজিব ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়ত করিলাম।

১৫। **নামাযের নিয়ম** ঃ নিয়ত করার পর নাভির নীচে হাত বেঁধে ছানা সকলেই পড়বে। তারপর ফাঁক ফাঁক করে তিনবার তাকবীর বলে কান পর্যন্ত হাত তুলবে। তৃতীয়বারের সময় হাত নাভির নীচে বাঁধবে। এরপর ইমাম সাহেরউচ্চস্বরে ছুরা ক্বেরাত পড়ে দুই রাকাআত নামায পড়বেন। শেষ রাকআতে ক্বেরাতের পর রুকুর পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলে হাত তুলে কান পর্যন্ত উঠায়ে ছেড়ে দেবেন। এরপর হাতছাড়া অবস্থায় রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা পাঠ করে ছালাম ফিরাবেন এবং তাকবীর তাশরীক তিন বার পাঠ করে খুৎবা শুরু করবেন। প্রথম খুতবা শেষ করে সামান্য বসবেন। দ্বিতীয় খুতবা শুরু করার পূর্বে ৭ বার তাকবীর তাশরীক পাঠ করবেন। খুতবা শেষে মিলাদ শরীফ পড়ে মুনাজাত করবেন। (আলমগীরী অবলম্বনে)।

হাদীস দ্বারা কিয়ামের প্রমাণ এবং ওহাবীদের দলীল খন্ডন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ.জলিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হাদীস দ্বারা কিয়াম করা সুন্নাত প্রমাণিত :-

১নং হাদীসঃ

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم . مُتَّفَق عَلَيْهِ. وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي بَابِ حِكْمِ الْإِسْرَاءِ - (مُتَّفَق عَلَيْهِ)

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন ঃ মদিনার একটি ইহুদী সম্প্রদায়-বনু কুরাইযা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনা আক্রমন করার অপরাধে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আত্মসমর্পনের উদ্দেশ্যে যখন হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) এর বিচার মেনে নিতে রাজী হলো। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাআদকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকটবতী স্থানে তাবুতে ছিলেন। হযরত সাআদ (রাঃ) গাধার পিঠে করে আসলেন। যখন তিনি মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন-তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপস্থিত মদিনাবাসী আনসারগণকে লক্ষ্য করে বললেন- "তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাও"।[১] ইয়াহুদীদের আত্মসমর্পনের বিচারকার্যের বিশদ বিবরণ বুখারীর যুদ্ধবন্দী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে।

বর্ণিত হাদীসে যা বলা হয়েছে-তা নিম্নরূপঃ

১। ইহুদী সম্প্রদায় ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় হুযুরের সাথে পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের অনুপস্থিতিতে মদিনা আক্রমণ করে বসে। কিন্তু হুযুরের ফুফু হযরত সুফিয়া (রাঃ) এর অসম সাহসিকতায় কয়েকজন ইহুদী নিহত হয়ে তাদের মৃতদেহ প্রাচীরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হলে বনু কোরাইযারা পলায়ন করে।

২। খন্দকের যুদ্ধ শেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিলম্বে মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত বনু কোরাইযার দূর্গ ঘেরাও করেন। দীর্ঘ ২৫ দিনের অবরোধের পর নিরূপায় হয়ে তারা আত্মসমর্পণে রাজী হয়। কিন্তু বিচারকার্যের জন্য তারা নবীজীকে না মেনে তাদেরই এককালীন আত্মীয় মদিনার আউছ গোত্রের সর্দার হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) কে বিচারক মেনে নেয়ার দাবী জানায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে রাজী হন। ঐ বিচারে তাদের যুদ্ধক্ষম ৭০০ পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীকে পরিণত করা হয় এবং ধন-সম্পদ সরকারী বাইতুল মাল-এ জমা করা হয়।

৩। মসজিদে নববীতে বিচারকার্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাআদের কাছে সংবাদ পাঠান।

৪। অসুস্থ সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) তাবু হতে গাধার পিঠে আরোহণ করে হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁর অবস্থান ছিল মসজিদে নববীর অতি নিকটে। তিনি খন্দকের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তাই গাধার পিঠে করে আসলেন। একজন নার্স তাঁর সেবা করছিলেন তাবুতে। (মিশকাত শরীফ)

৫। যখন সাদ (রাঃ) মসজিদে নববীর কাছাকাছি পৌছলেন- তখন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁকে সভাস্থলে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য মদিনাবাসী আনসারগণকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন এবং বললেন তোমরা সব আনসারগণ তোমাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও এবং তাঁকে অবতরণ করতে সহযোগিতা করো।

উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে বিবেচ্য বিষয় বা (مقام استشهاد) হলো সম্মানার্থে দাঁড়ানো। বর্ণিত হাদীসে

[১]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ, ১/১৩৩১ পৃ. হাদিস নং- ৪৬৯৫ ।

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم বাক্যের মধ্যে প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। قُومُوا إِلَى এর অর্থ সম্মানার্থে, সাহায্যার্থে দাঁড়ানো- উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য কিয়ামের উদ্দেশ্যও হচ্ছে প্রধানতঃ সম্মানার্থে দাঁড়ানো, দ্বিতীয়তঃ সাহায্যার্থে। আল্লামা ইবনে কাছির তার বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে إِلَى سَيِّدِكُم এর পরিবর্তে لسيدكم وخيركم বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। (বেদায়া ও নেহায়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা-১২৩) এর অর্থ হলো- হে আনসারগণ তোমরা তোমাদের সম্মানীত নেতার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও। এতেই আরোও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, إِلَى অর্থ সম্মানার্থে ও সাহায্যার্থে হলেও এখানে সাহায্যার্থে নয়- বরং সম্মানার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, একই রাবীর অন্য রেওয়ায়াতে إِلَى سَيِّدِكُم এর পরিবর্তে لسيدكم এসেছে। আর লাম মাজরুর ব্যবহৃত হয় সম্মান ও তাজীমের জন্য। অতএব এক রেওয়ায়াতে দুই অর্থবোধক إِلَى শব্দ থাকলেও অন্য রেওয়ায়াতে ل মাজরুর পরিস্কার ভাবে বলে দিচ্ছে যে- আনসারদের উক্ত কিয়ামটি ছিল তাজীমী কিয়াম এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশও ছিল তাজীমী কিয়ামের জন্য। সুতরাং অত্র হাদীস দ্বারা এবং إِلَى ও ل মাজরুর যুক্ত ইবনে কাছিরের উভয় রেওয়ায়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমানিত হলো যে তাজীমী কিয়াম করা সুন্নাত।

সন্দেহ সৃষ্টি ঃ

কিয়াম বিরোধীরা বলে- এখানে রোগীর সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কিয়াম করার জন্য নবীজী সব আনসারদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেওবন্দীদের এই অপব্যাখ্যার আর কোন অবকাশ নেই। তারা বলে ঐ কিয়ামের নির্দেশ নাকি নবীজী সাহায্যের জন্য দিয়েছিলেন-তাদের এই ব্যাখ্যা ভুল। ইবনে কাছিরের ব্যাখ্যাই সঠিক। আনসারগণের কিয়াম ছিল সম্মানার্থে সাহায্যের জন্য ছিলনা। কেননা, নবীজী বলেছেন-قُومُوا তোমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাও। রোগীর সাহায্যের জন্য সকল আনসারের দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিলনা। কতিপয় আনসারই যথেষ্ট ছিলেন। কিন্তু নবীজি সবাইকে দাঁড়িয়ে যেতে বলার মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায়- ঐ নির্দেশ ছিল সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। আবার বলেছেন إِلَى سَيِّدِكُم তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে। নেতা শব্দ দ্বারাই বুঝা যায় যে, নেতার সম্মানের উদ্দেশ্যে দাড়ানোর জন্যই হুকুম ছিল। রোগীর উদ্দেশ্যে নয়। রোগীর সাহায্যার্তে হলে এরূপ বলতেন قوموا الى مريضكم অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রোগীর সাহায্যার্তে দাঁড়াও। ওহাবীরা الى শব্দটি দ্বারা বুঝাতে চায় যে, উক্ত কিয়ামটি ছিল রোগীর সাহায্যার্তে। তারা إِلَى سَيِّدِكُم শব্দটি দেখলো কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত لسيدكم শব্দটি দেখলনা কেন? তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয় আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন- إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা করবে তখন ওজু করে নাও। এখানেও তো الى শব্দটি আছে। এক্ষেত্রে তারা কি ব্যাখ্যা দিবে? এখানে তো নামাযে জন্য দাঁড়ানোর কথা আছে। الى অর্থ যদি সাহায্য হয় তা হলে নামায কোন রোগী হলো যে, তার সাহায্যার্থে দাড়াতে হবে? তদুপরি হযরত সাআদ (রাঃ) রোগী হলে দুই তিনজনকে নির্দেশ করতেন এবং বলতেন- قوموا الى مريضكم রোগীর সাহায্যার্থে দাঁড়াও। তা না করে নেতা উল্লেখ করে সমস্ত আনসারকে নির্দেশ দেয়ার মধ্যেই তাজীমী কিয়ামের প্রমান পাওয়া যায়। মক্কার মুহাজিরগণকে তিনি দাঁড়াতে বলেন নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা কিয়াম বিরোধী তারা এই হাদীস খানার অপব্যাখ্যা করে হযরত সাআদের রোগের বাহানা দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে এবং অল্প শিক্ষিত অথবা দুর্বল আলেমদেরকে ধোকায় ফেলে দিচ্ছে। এসব দেওবন্দী এবং ওহাবী ধোকাবাজী থেকে আল্লাহ সকলকে রক্ষ করুন। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রাঃ) বলেন- হযরত সাআদের আগমনে হিকমত নিহিত ছিল যে, যেহেতু তিনি ছিলেন ঐ দিন বিচারপতির আসনে আসীন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার প্রধান ব্যক্তি। তাই তাঁর মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করাই যুক্তিযুক্ত ছিল।

(আশিআতুল লোমআত ফারসী- শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ) এর আরও মন্তব্য লক্ষ্য করুনঃ

اجماع کرده اند جماهیر علماء باین حدیث در اکرام اهل فضل از علم باصلاح یا شرف- ونوورگفته که این قیام مر اهل فضل را وقت قدوم او ردن ایشان مستحب است واحادیث درین باب ورود یا فته- ودر نهی ازان صریحا پیزے صحیح نه شده- ازقنیه نقل کرده که مکروه نیست قیام جالس از براے کسی که درا مده است بروے بجهت تعظیم-

অর্থ ঃ হযরত সাআদ (রাঃ) এর সম্মানার্থে মদিনা শরীফের আনসারগণকে দাঁড়ানোর নির্দেশ সম্বলিত হাদীসের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম ও হাদীস বিশারদগণ হাক্কানী ওলামাদের তাজীম করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আল্লামা নববী (রাঃ) বলেছেন বুযুর্গ ব্যক্তিদের আগমনকালে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাদের সম্মানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিষেধমূলক কোন স্পষ্ট বর্ণনা বা হাদীস পাওয়া যায় না। কুনিয়া নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি আছে যে, বসা অবস্থার কোন ব্যক্তি আগত কোন ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ালে মাকরূহ হবেনা। (আশিয়াতুল লোমআত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ))। কিয়াম বিরোধীরা শেখ দেহলভী সাহেবের ব্যাখ্যা উপেক্ষা করে নিজেরা মনগড়া ব্যাখ্যা করে।

২নং হাদীস ঃ

সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবীজীর সম্মানে সাহাবাগণের দাঁড়ানের বর্ণনাটি তিনি এভাবে দিয়েছেনঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قد دخل بعض بيُوت أَزوَاج-

অর্থাৎ ঃ "হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে আমাদের মাঝে বসে সব সময় পবিত্র হাদীস বয়ান করতেন। যখন তিনি মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন আমরাও তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতাম। যে পর্যন্ত না তিনি কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করতেন সে পর্যন্ত আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকতাম"।[১]

উক্ত হাদীস পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, যখনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন তখনই সাহাবাগণও আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন। শুধু তাই নয় বরং ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ হুযুরকে দেখা যেতো। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, হুজুরের বিদায়ের পরেও তারা বসতেন না বরং যতক্ষণ দেখা যেত ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন।দীর্ঘ কিয়ামের প্রমাণ সত্ত্বেও যারা বলে কিয়াম করা হারাম ও বিদআত বাহুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য কিয়াম না পছন্দ করতেন ইত্যাদি তারা মহাভুলের মধ্যে নিঃপতিত।

উপরে উল্লেখিত দুটি হাদীসে প্রমাণিত হলো যে, কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা সম্মানীত ব্যক্তিদের জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানার্থে সাহাবীগণ আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে পর্যন্ত তিনি দৃষ্টির আড়াল না হতেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ নবীজীর বিদায়ের পরে সম্মানার্থে কিয়াম করতেন। কিয়াম যদি না জায়েয হতো অথবা তিনি যদি নিজের জন্য সব সময় কিয়াম না পছন্দ করতেন তাহলে সাহাবীগণকে নিষেধ করলেন না কেন?

কিয়াম বিরোধীদের অপব্যাখ্যামূলক দলীল খন্ডন ঃ

ওহাবী সম্প্রদায় কিয়াম বিরোধী। তারা কিয়ামকে হারাম বলে, বিদআত বলে এবং তাদের দাবীর পক্ষে কিছু হাদীসও পেশ করে - কিন্তু তার সঠিক ব্যাখ্যা করে না। যদিও ব্যাখ্যা করে তাহলে অপব্যাখ্যা করে। যেমনঃ

১নংহাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ -

[১]. মিশকাত শরীফ ৩/১৩৩২, হাদীস নং ৪৭০৫।

অর্থঃ হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন সাহাবায়ে কেরামের নিকট নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিলেন না। যখন তাঁরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আগমন করতে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা অবগত ছিলেন যে, তিনি এরূপ করা অপছন্দ করতেন।[১]

২নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

مُعَاوِيَةُ بْنِ سُفْيَا نُ قَا لَقَا لَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থঃ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি এরূপ পছন্দ করে যে, লোকেরা তাঁর সামনে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।[২]

৩নং হাদীস ঃ (ওহাবী দলীল)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا-

অর্থ ঃ **"হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে ঘর দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন তোমরা পারস্য দেশীয় লোকদের মত কিয়াম করোনা। তারা একজন অপরজনকে যেভাবে তাজীম করে সে ভাবে নয়"।**[৩]

সন্দেহ খন্ডন মূলক জবাব ঃ

উপরোক্ত তিনটি হাদীস মেশকাত শরীফে সঙ্কলিত হয়েছে। তিরমিজি ও আবু দাউদ উক্ত হাদীসগুলো নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এগুলোতে বিশেষ ধরনের কিয়ামকে নিষেধ করা হয়েছে। মূল কিয়াম যে সুন্নাত তার প্রমাণ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এবই মিশকাত শরীফে কিয়ামের পক্ষে হযরত আবু হোরায়রার হাদীস এবং হযরত সাআদ (রাঃ) সংক্রান্ত আবু সাঊদ খুদরী (রাঃ) রহ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ননা করেছেন যা একটু আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাহলে কিয়ামের পক্ষে ও বিপক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলো একসাথে করে বিশ্লেষণ না করে ঢালাওভাবে কিয়াম নিষিদ্ধ বলার মধ্যে তো সততার প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এটা কোন ঈমানদার আলেমের কাজ হওয়া ও উচিত নয়।

এখন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উল্লেখিত প্রথম হাদীসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতার সম্মানে দাঁড়ানোর নির্দেশ করেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসে হুজুরের সম্মানে সাহাবীগণের দীর্ঘ কিয়ামের বিষয়ে হুজুরের কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। তাহলে বাকী তিন হাদীসে তিনি কি কারণে কিয়াম নিষেধ করলেন? কোন পরিবেশে তিনি সাহাবীদের দাঁড়ানো অপছন্দ করেছেন এবং কোন ধরনের কিয়ামকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন তা খতিয়ে দেখলেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে যে, কি কারণে তিনি ঐ বিশেষ ধরনের কিয়াম অপছন্দ করেছেন।

হযরত আনাছ বর্ণিত হাদীসের জবাব

কিয়াম বিরোধীদের পেশকৃত প্রথম হাদীসে বুঝা যায় যে, সাহাবীগণ হুযুরের আগমনে কিয়াম করতেন না। কেননা তিনি এরূপ কিয়াম করা পছন্দ করতেন না। এরূপ কিয়াম এর ধরন সম্বন্ধে মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) মিরকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

قوله لذالك اى لقيامهم تواضعا لربه مخالفة لعادة المتكبرين-

অর্থঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের ঐ ধরনের কিয়ামকেই অপছন্দ করতেন যে ধরনের চরম বিনয়মূলক কিয়াম আল্লাহর জন্য করা হয়। অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য যে ধরনের বিনয়মূলক কিয়াম করা হয় ঐ ধরনের কিয়ামের বিরোধিতা করতেন।[৪]

[অন্য একটি জবাব হলো- হাদীস খানা সাহাবীর

[১]. জামি তিরমিজী শরীফ, ৫/৯০পৃ., হাদীস নং- ২৭৫৪।
[২]. জামি তিরমিযী শরীফ, ৪/৩৮৭পৃ., হাদীস নং- ২৭৫৫।
[৩]. সুনান আবি দাউদ শরীফ. ৪/৩৫৮পৃ., হাদীস নং- ৫২৩০।
[৪]. মিরকাত শরীফ।

ব্যক্তিগত অভিমত। ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষ্য নয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমোদিত কিয়াম হলো যা আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন]। **তৃতীয় জবাব হলো**- এই অপছন্দ ছিল বিনয় মূলক- নিষেধ মূলক নয়- (লেখক)।

মোল্লা আলী ক্বারী ব্যাখ্যার দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেলো যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল কিয়ামকে অপছন্দ করতেন না বরং আল্লাহর সামনে অথবা অহংকারীদের সামনে যে ধরনের কিয়াম করা হয় সে ধরনের কিয়ামকেই তিনি অপছন্দ করতেন এবং সাহাবীগণ সেই ধরনের কিয়াম থেকে বিরত থাকতেন। হযরত আনাছের বর্ণনার উদ্দেশ্য ও তাই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর সাথে তিনিও মসজিদে হুযুরের সম্মানে কিয়াম করতেন। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহংকার মূলক কিয়ামকেই অপছন্দ করতেন। তাজিমী ও বিনয় মূলক কিয়াম সাহাবীগণের অমঙ্গল। এটিই সঠিক ব্যাখ্যা।

হযরত মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের জবাব

কিয়াম বিরোধীদেরপেশকৃত দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, কারো সম্মানে মূর্তিবৎদাঁড়িয়ে থাকাকেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন- মূল কিয়ামকে নয়। হাদীস খানা স্বব্যাখ্যাত। তদুপরি হাদীস খানা হুযুরের বেলায় প্রযোজ্য নয়। অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হুযুরের এই নিষেধ ছিল শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ মূর্তিবৎ কিয়াম নিষিদ্ধ -মূল কিয়াম নিষিদ্ধ নয়।

হযরত আবু উমামার হাদীসের জবাব

কিয়াম বিরোধীদেরপেশকৃত তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে- পারস্যবাসীদের ন্যায় নতজানু হয়ে মূর্তিবৎ রাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মত কিয়াম অবশ্যই নিষিদ্ধ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুরূপ মূর্তিবৎ নতজানুর কিয়ামকেই নিষিদ্ধ করেছেন- মূল কিয়ামকে নিষিদ্ধ করেননি। তিনি একথা বলেননি তোমরা কিয়াম করোনা বরং বলেছেন পারস্যবাসী অগ্নি পূজকের ন্যায় কিয়াম করোনা। এর অর্থ হলো পানি পান করো তবে গরুর মতো নয়। অনুরূপভাবে হাদীসের অর্থ হবে কিয়াম করো তবে পারস্যবাসী অগ্নি উপাসকদের মত নতজানু হয়ে নয়। কিয়াম বিরোধীরা ব্যাখ্যা না করেই শাব্দিক অর্থে হাদীস বয়ান করায় ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। তারা হাদীসকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে মাত্র। যদি তারা সত্য গ্রহণ করতো এবং সঠিক জিনিষ মেনে নিতো তাহলে হযরত সাআদ ও হযরত আবু হোরায়রার হাদীস দুটিও বর্ণনা করতো। কিন্তু তারা তা করেনা। দুটিকে গোপন করে তাদের স্বপক্ষের বাহ্যিক সহায়ক তিনটি হাদীস তারা আক্ষরিক অর্থে প্রচার করে। এটা আমানতদারী নয় বরং রাসূলে পাকের হাদীস গোপন করার অপরাধ। অত্র হাদীসে সাহাবীগণের কিয়ামের বিশেষ ধরন দেখেই তিনি ঐ ধরনের কিয়াম না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ওহাবীরা বুঝেছে- তিনি সবধরনের কিয়াম নিষেধ করেছেন।

৪। কিয়ামে মোস্তাহাব ঃ ছয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে ৪র্থ হলো মোস্তাহাব কিয়াম নফল নামাযে দাঁড়ানো মোস্তাহাব। বসে পড়লেও জায়েয কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে দ্বিগুন সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন হাদীসে এসছে- صلوة القاعد نصف القائم

অর্থাৎ ঃ "বসে নামায আদায়কারীর সওয়াব দন্ডায়মান অবস্থায় নামায আদায়কারীর অর্ধেক"।

তবে বিতরের পরের দুরাকাত হালকি নফল বসে পড়ায় পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। এতে নবীজীর অনুকরণ করা হয়ে থাকে। আগমনকারীর সম্মানে দাঁড়ানোও মোস্তাহাব (দুররে মোখতার)। কোন প্রিয়জনের আলোচনা শুনে অথবা কোন শুভ সংবাদ শুনে দাঁড়ানো ও মোস্তাহাব এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনদেরআমল। মিশকাত কিতাবুল ঈমান তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে-

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন- "হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) আমাকে কোন একটি শুভ সংবাদ শুনালেন। আমি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম- আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক- বরং আপনিই উক্ত শুভ সংবাদের প্রকৃত উপযুক্ত ব্যক্তি"।[১] হুযুর সাল্লাল্লাহু

[১]. মিশকাত শরীফ, কিতাবুল ঈমান।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের সু-সংবাদ শুনে কিয়াম করা মোস্তাহাব।

৫। **কিয়ামে মাকরূহ** ঃ কয়েক অবস্থায় কিয়াম বা দাঁড়ানো মাকরূহ। যেমন- যমযম পানি ও অজুর অবশিষ্ট পানি ব্যতিত অন্যান্য পানীয় পান করার সময় দাঁড়ানো মাকরূহ। কোন ওযর থাকলে অন্য কথা। অনুরূপভাবে কোন বিত্তশালির জন্য লোভের বশবর্তী হয়ে দাঁড়ানো বা দুনিয়াদার লোকের সম্মানে দাঁড়ানো মাকরূহ।

৬। **কিয়ামে হারাম** ঃ কারো সম্মানে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকা হারাম। নতজানু হয়ে কারো সম্মান করা হারাম। এরূপ সম্মান গ্রহণকারীর সম্মান করাও হারাম।[১] কাফেরদের সম্মানে দাঁড়ানো হারাম। মুয়াবিয়া ও আবু উমামার বর্নিত ২ ও ৩ নং হাদীস মোতাবেক মূর্তিবৎ ও অহংকারী লোকদের জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কে দেখুন। উপরোক্ত ছয় প্রকার কিয়ামের মধ্যে ৪র্থ প্রকারের কিয়াম অর্থৎ মিলাদ শরীফের কিয়াম মোস্তাহাব ও মুস্তাহসান। মিলাদ শরীফে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত বর্ণনা কালে ঐ সময় কিয়াম করা মোস্তাহাব ও মোস্তাহসান।

ফতোয়া ঃ

১। আল্লামা বারজিঞ্জি মউলুদে বারজিঞ্জিতে ফতোয়া দিয়েছেনঃ

واستحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو رواية وروية"

অর্থাৎ ঃ "হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত শরীফ বাশুভাগমনের বর্ণনাকালে ঐ সময়ে দাঁড়ানো বা কিয়াম করাকে রেওয়ায়াত ও দিরায়াতের অধিকারী ইমাম মুজতাহিদগণ মোস্তাহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন"। (মৌলুদে বারজিঞ্জি) উল্লেখ্য যে, আল্লামা বারজিঞ্জী মুজতাহিদ ছিলেন।

২। আল্লামা সৈয়দ আবু বকর ওরফে সৈয়দ বাকারী (মক্কা) স্বীয় গ্রন্থ اعانة الطالبين। ৩য় খন্ড ৩৬৫ পৃষ্ঠায় মিলাদের কিয়ামকে মোস্তহসান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর ইবারত নিম্নরূপঃ

وقد بسط الكلام على ذلك شيخ الإسلام ببلد الله الحرام مولانا وأستاذنا العارف بربه المنان سيدنا أحمد بن زيني دحلان في سيرته النبوية، ولا بأس بإيراده هنا، فأقول: قال رضي الله عنه ومتعنا والمسلمين بحياته. (فائدة) جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه - صلى الله عليه وسلم - يقومون تعظيما له - صلى الله عليه وسلم - وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك كثير من علماء الأمة الذين يقتدى بهم.

অর্থ ঃ "মিলাদ কিয়াম সম্পর্কে আল্লাহর পবিত্র শহরের শাইখুল ইসলাম (মক্কার মুফতীয়ে আযম আমার(সৈয়দ বাকারী) মনিব ও ওস্তাদ আরিফ বিল্লাহ সৈয়্যদুনা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহলান মককী তাঁর প্রণীত সিরাতুন্নবী গ্রন্থে ফতোয়া দিয়েছেন যে, হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত বর্ণনাকালে যখন উপস্থিত লোকজন হুযুরের পবিত্র শুভাগমনের শুভ সংবাদ শুনেন তখন প্রচলিত প্রথা মোতাবেক তারা হুযুরের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। এটা যুগ যুগান্তরের প্রচলিত ধারা। এইড কিয়ামটি হচ্ছে মোস্তাহসান। কেননা, এতে রয়েছে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। উম্মতের মধ্যে এমন সব গন্যমান্য উলামায়ে কেরাম উক্ত কিয়াম করেছেন যাদেরকে লোকেরা পেশোয়া বা অনুসরণীয় হিসাবে গণ্য করেন"।[২]

মিলাদ কিয়াম সমর্থক ইমামগণের অভিমত ঃ

১। মিলাদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রাহঃ) বলেছেন-

قال الحسن البصري، قدس الله سره: وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته على قراءة مولد الرسول.

অর্থ ঃ "হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তাহলে ঐ স্বর্ণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১]. ফতোয়ায়ে শামী- আলমগীর।

[২]. ইয়ানাতুত ত্বালেবীন, ৩/৩৬৫ পৃ.।

ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ শরীফে ব্যয় করে দেয়া আমার অতি প্রিয় কাজ"।[১]

২। বিশ্ব বিখ্যাত ওলী হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

قال الجنيدي البغدادي رحمه الله: من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالإيمان.

অর্থ ঃ "হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ শরীফের মজলিসে উপস্থিত হবে এবং মিলাদ শরীফের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে- তারা ঈমানের দ্বারা সফলকাম হবে"।[২]

হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

قال معروف الكرخي قدس الله سره : من هيأ لأجل قراءة مولد الرسول طعاما، وجمع إخوانا، وأوقد سراجا، ولبس جديدا، وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين

অর্থ ঃ "হযরত মারূফ কারাখী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন- যারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিলাদ শরীফ উপলক্ষে খানা তৈরী করবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে একত্রিত করবে, মজলিসকে অলোকসজ্জিত করবে, নতুত পোষাক পরিধান করবে, আতর এবং খুশবু লাগাবে ও মজলিসকে খুশবুদার করবে এবং এসব কিছুর উদ্দেশ্য হবে রাসূলে পাকের সম্মান প্রদর্শন করা তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে হাশর নসীব করবেন"।[৩]

বিঃ দ্রঃ এই ফতোয়া গ্রন্থটি মক্কা শরীফে লিখিত এবং প্রকাশিত। চার খন্ডে সমাপ্ত। লেখক হচ্ছেন আল্লামা সাইয়েদ আবু বকর ওরফে সাইয়েদ বাকারী (রাহঃ)।

কিয়াম সমর্থক ইমামগণ ঃ

যে সব বরণীয় ও অনুসরণীয় উলামা ও মুজতাহিদগণ উক্ত মিলাদ ও কিয়াম করতেন-তাঁদের মধ্যে ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকি, আল্লামা নবভীর উস্তাদ ইমাম আবু শামা, আল্লামা ছাখাভী, আল্লামা ইবনে জওজী, আল্লামা সিবতু ইবনে জওজী, হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী, হাফেজ শামছুদ্দীন শামী, হযরত হাসান বসরী, হযরত জুনাইদ বাগদাদী, ইমাম ইয়াফেয়ী, হযরত সিররী সাকতী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ-মণিষীদের নাম আল্লামা সৈয়দ বাকারী (রাহঃ) তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৪]

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মক্কা মোয়াজ্জমার মুফতীয়ে আযম শাইখুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আহমদ ইবনে জাঈনী দাহলান মককী (রাহঃ) মিলাদের কিয়ামকে বলছেন মোস্তাহসান, আর দেওবন্দের রশীদ আহমদ, খলিল আহমদ, আশ্রাফ আলী গং বলছে বিদআত ও হারাম। কার কথা ও ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে-পাঠকরাই ঠিক করবেন। কোথায় মক্কা মোয়াজ্জমার ফতোয়া-আর কোথায় দেওবন্দের ফতোয়াবাজী। (লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা)

সংশয় নিরসন

কোন কোন রেওয়ায়াতে দেখা যায়- মিলাদ ও কিয়াম প্রথা হিসাবে প্রথম তিন যুগে ছিলনা। সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে তা প্রথা হিসাবে চালু হয়েছে। এ কারণে একে বিদআতে হাসানা বলা হয়। অথচ ইবনে হাজর হায়তামীর রেওয়ায়াতে দেখা যায়-চার খলিফার যুগেও মিলাদ ছিল। ইবনে কাসিরের বর্ণনায় দেখা যায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) মিলাদ ও কিয়াম করেছিলেন। এই দুই বর্ণনার মধ্যে কোনটি সঠিক? এমন সংশয় দেখা দেয়া দেয়া স্বাভাবিক। **এর সমাধান হচ্ছে এই প্রথম যুগে মিলাদ ও কেয়াম রেওয়াজ হিসাবে এবং প্রথা হিসাবে চালু ছিলনা। কখনও হতো,** আবার কখনও হতোনা। ৭ম শতাব্দী হিজরীতে এসে তা নিয়মিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। যেমনঃ তারাবির নামাজ প্রথমে জামাতবদ্ধভাবে হতোনা। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে এসে নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে বিশ রাকআত চালু হয়ে যায়। এই প্রথাকেই হযরত উমর (রাঃ) শাব্দিক অর্থে

[১]. ইয়ানাতুত ত্বালেবীন, ৩/৩৬৬ পৃ.।
[২]. ইয়ানাতুত ত্বালেবীন, ৩/৩৬৬ পৃ.।
[৩]. ইয়ানাতুত ত্বালেবীন, ৩/৩৬৬ পৃ.।
[৪]. উক্ত ইয়ানাতুত ত্বালেবীন, ৩৬৫-৩৬৫ পৃ. দেখুন।

উত্তম বেদআত বলেছেন। মূল তারাবির নামাজকে তিনি বেদআত বলেননি। তদ্রূপ মিলাদুন্নবীর মূল কাজটি বেদআত নয়। পরবর্তী যুগে নির্দিষ্ট আকারে ও প্রকারে নিয়মিত প্রথা হিসাবে চালু হওয়াকেই কোন কোন কিতাবে শাব্দিক অর্থে উত্তম বেদআত বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন সংঘাত ও পার্থক্য নেই। দেওবন্দী আলেম রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী বলেছেন বিদআতে হাছানা মূলতঃ সুন্নাত। কেননা হাদীসে অনুরূপ বলা হয়েছে। বর্তমান কালেও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয়ে থাকে। বাগদাদ শরীফে গাউসুল আজম মসজিদে মিলাদ শরীফ পাঠ করা হয় দাঁড়িয়েদাঁড়িয়ে ২/৩ ঘন্টাব্যাপী। ঐ সময়ে দিওয়ানে হাসসান থেকে নবীজীর শানে কাসিদা পাঠ করা হয়। অধীন লেখক ১৯৮২ সালে শুক্রবাবে এমন এক মিলাদ মাহফিলে শরীক ছিলাম। শর্ষিনার মরহুম পীর আবু জাফর সাহেবও সাথে ছিলেন।

শেষ কথা

পবিত্র মিলাদুন্নবীর প্রচলন সর্বযুগেই ছিল। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে আকার ও প্রকারের বিভিন্নতা ছিল এবং এখনও আছে। মিলাদ বিরোধিরাও বসে বসে কোন কোন সময় মিলাদের নামে শুধু দুরূদ পড়ে।এটা তাদের ধোঁকাবাজী। তারা ইয়া নাবী, ইয়া রাসূল- বলে সম্বোধন করাকে শিরিক বলে এবং কিয়ামকে হারাম বলে। সমস্বরে ইয়া নাবী সালাম আলাইকা- পাঠ করাকে ফতোয়ায়ে রশিদিয়াতে কৃষ্ণলীলার গান বলে উপহাস করা হয়েছে এবং ইয়া রাসল্লুল্লাহ বাক্যটিকে কুফর সদৃশ বাক্য বলা হয়েছ- (ফতোয়া রাশিদিয়া পৃষ্ঠা ৬২)। দেওবন্দী আলেমদের অধিকাংশই মিলাদ ও কিয়াম বিরোধী। যেখানে সুন্নী আলেম আছে, সেখানে তারা বলে কিয়াম করা মোস্তাহাব করলেও চলে, না করলেও ক্ষতি নেই আবার যেখানে সুন্নী আলেম কম বা দুর্বল থাকে, সেখানে বলে কিয়াম করা হারামও শিরক ইত্যাদি। হানাফী মাজহাবের ইমাম ইব্রাহীম হলবী রুহুস সিয়ার (সীরতে হলবী নামে খ্যাত) গ্রন্থেও এক জায়গায় লিখেনঃ

القيام مستحسن فمن فعله فقد احسن ومن لا فلا- ومن انكر فقد كفر-

অর্থাৎ ঃ "কিয়াম করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি কিয়াম করবে সে মোস্তাহসান কাজের সওয়াব পাবে। আর যে করবেনা সে সওয়ার থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নীতিগতভাবে কিয়াম মানবেনা বরং অস্বীকার করবে সে কাফের হবে"। (সীরতে হলবী-রূহুস সিয়ার)। ইহাই চরান্ত ফতোয়া।

মিলাদুন্নবীর মাহফিল ও কিয়াম সম্পর্কে যে সব দলীল পেশ করা হলো তার চেয়ে অনেক বেশী দলীল আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রাহঃ) আন নেমাতুল কোবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। যারা মানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য যথেষ্ঠ। আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রাহঃ) তাঁর গ্রন্থে (আন নেমাতুল কোবরা) আরো কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ও শাইখের (রাহঃ) নাম এবং তাদের ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। তারা হচ্ছেন- (১) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) (২) হযরত মারুফ কারাখী (রহঃ) (৩) হযরত সিররি সাকাতী (রহঃ) (৪) হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ) প্রমুখ মনিষী। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সাহাবা যুগ থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগেই মিলাদুন্নবীর প্রচলন ছিল। এসব মহা মনিষীগণের ফতোয়ার মোকাবিলায় ফাকেহানী, ইবনে ওহাব নজদী, রশিদ আহমদ, খলীল আহমদ, আশ্রাফ আলী থানবী গংদের মতামতের কি মূল্য আছে? ওহাবীদের পীর বলে খ্যাত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজিরে মক্কী বলেন- "আমি মিলাদ মাহফিলে শরীক হই, নিজেও মিলাদ কিয়াম করে থাকি এবং খুবই আনন্দ পাই"। (ফয়সালা হাফত মাসায়েল)। আমাদের দেশের ওহাবী সম্প্রদায়ের আলেমরাই মানুষকে গোমরাহ করছে। সরলপ্রাণ মুসলমানের কোন দোষ নেই। রাসূলের পক্ষে থাকার মধ্যেই নাজাত নিহিত। বিপক্ষে যাওয়ার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলের প্রতি মহব্বত মূলক কাজের তৌফিক দিন। আমিন- (লেখকের পৃথক গ্রন্থ "ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)" তে মিলাদ ও কিয়াম এর

তারতীব, নিয়ম কানুন, বিভিন্ন আশেকানা নাত শরীফ সমর্থনকারী পীর মাশায়েখ এবং জগত বরেণ্য উলামায়ে কিরামের তালিকা দেখুন)। নিম্নে তাদের নাম পেশ করা হলো ঃ

১. ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (২) ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকী (৩) আল্লামা ইবনে দাহইয়া (৬০৪ হিজরী) (৪) ইমাম নভবী ও আল্লামা আবু শামা (৫) ইছমাইল হাক্কী (রুহুল বয়ান তাফছীর এর লেখক) (৬) জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (তাফছীর ই জালালাইন এর লেখক) (৭) ইবনে হাজার হায়তামী (৮) আল্লামা ইবনে কাছীর (তাফছীরে ইবনে কাছীর এর লেখক) (৯) শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (১০) শাহ আব্দুর রহিম দেহলভী (১১) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (১২) শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (১৩) আল্লামা ইউছুফ নাবহানী (১৪) আহমদ রেজা খান বেরেলভী (ইমামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। (১৫) আল্লামা আহমদ সাঈদ কাজিমি (১৬) সদরুল আফাজিল নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (১৭) আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (১৮) আল্লামা আব্দুস ছামী রামপুরী (১৯) আল্লামা হাশমত আলী রেজভী (২০) আল্লামা মুফতি আমজাদ আলী (২১) আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (২৩) আল্লামা আবেদ শাহ মুজাদ্দেদী ও (২৪) মাওলানা কাজী ফজলে আহমদ লুধিয়ান প্রমুখ মনিষীবৃন্দ এবং জৌনপুর ও ফুরফুরা খান্দান, ছিরিকোটি দরবার, কুমিল্লা শাহপুর দরবার এবং সমস্ত সুন্নী পীর মাশায়েখগণের দরবারসমূহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত — ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ,

রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ এশা হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

www.sunnibarta.com

দরূদ শরীফের অনন্য গ্রন্থ

মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা]

মুহাম্মাদ বদিউল আলম রিজভী

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম আল ইসলামের বাণী শাশ্বত চিরন্তন, এর আবেদন বিশ্বজনীন, সার্বজনীন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ মহাগ্রন্থ "আল কুরআন" বিশ্বের দ্বিতীয়, অবিকৃত ধর্ম গ্রন্থ। ঐশীগ্রন্থ আল-কুরাআনের পূর্ণাঙ্গতা কালোত্তীর্ণ। এটাই একমাত্র গ্রন্থ, যার শুরুতে নির্ভুল, ত্রুটি মুক্ত হওয়অর দাবী করা হয়েছে। রাব্বুল আলামীনের এ দাবীল যথার্থত ও সত্যতা আজ প্রতিষ্ঠিত। ত্রিশপারা সম্বলিত এ পবিত্র গ্রন্থ এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, মানবতার মুক্তির সনদ, আল্লাহর একত্ববাদেও এক অভ্রান্ত দলীল। নবীর রেছালত ও নবুয়তের এক অত্যুজ্জল স্বাক্ষার। ত্রিশপারা কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শের এক ঐতিহাসিক দলীল পবিত্র হাদিস শরীফ। সর্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জীবনালেখ্য সম্পর্কিত ত্রিশপারা কুরআনের আলোকে রচিত একমাত্র হাদিস, বোখারী শরীফ।

বোখারী শরীফের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শানে দরূদ শরীফের উপর লিখিত ত্রিশপারা সম্বলিত একমাত্র অদ্বিতীয় গ্রন্থ মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াত-ই- রাসুল। এ গ্রন্থের পূর্ণানাম মুহায়য়্যিরুল উকুল ফী বায়ানে আওসাফ- ই- আক্বিলিল উকুল মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)। এ বরকতময় দরূদ শরীফ গ্রন্থের প্রণেতা খাজায়ে খাজেগান, খলিফায়ে শাহে জিলান, মা'য়ারেফে লুদুন্নীর প্রস্রবন, উলুমে ইলাহীর ধারক গুপ্তহস্যাবলীর অন্তর্দ্রষ্টা, হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (কাদ্দাসাল্লাহু সিররুহুল আজীজ), এ মহান অলী কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, ছোট বেলায় পবিত্র কুরআন শরীফ হেফজ করেন মাত্র। এ ছাড়া অন্য কোন শিক্ষকের শরনাপন্ন হননি। অথচ, তিনিই পৃথিবীর এক বিস্ময়কর অদ্বিতীয় গ্রন্থ প্রণেতা। এ গ্রন্থ রচনা তার গাউসিয়তে কোবরা ও বেলায়তে ওজমার এক উজ্জ্বল নিদর্শ। এ বিশাল গ্রন্থ ইসলামের এক মহান সম্পদ। এ বিশাল গ্রন্থের যিনি প্রণেতা তিনি বেলায়তের কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব, তার যথার্থ মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দুঃসাধ্য। তার জীবন কর্ম ও সাধনার মূল্যায়ন করা দুঃসাহসের নামান্তর। তথাপি তার প্রণীত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার লক্ষ্যে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

রচনাকাল ঃ

ইল্‌মে লুদুন্নীর ধারক- বাহক, খোদা প্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞানের ধনভান্ডার, কুদরতে ইলাহীর প্রকাশস্থল, আরেফে লা'সানী, মাহবুবে সোবহানী, খলিফায়ে শাহেজিলানী, হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহঃ) প্রনীত ত্রিশপারা দরূদ শরীফ প্রতি পারা ৪৮ পৃষ্ঠা করে ১৪৪০ পৃষ্ঠার এ বিশাল গ্রন্থখানা ১২ বছর ৮ মাস ২০ দিনে রচনা সম্পন্ন হয়েছে। যা প্রণেতার কামালিয়াত, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। দুনিয়ার কোন শিক্ষাঙ্গন বা শিক্ষকের সান্নিধ্যে গমন না করা সত্তেও এতো বিশাল কর্ম সম্পাদন করা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ আশ্চার্য কাজটি সম্পাদন করেন এ মহান আধাত্মিক সাধক, ইনসানে কামিল হযরত খাজা চৌহরভী (রহঃ)।

প্রকাশ কাল ঃ

হযরত খাজা আবদুল রহমান চৌহরভী (রহঃ) বিরচিত মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে-ই-রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভূমিকাসহ ৩য় সংস্করণ ছাপনো হয় এবং মোর্শেদ বরহক আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ) এর নির্দেশে তার জীবদ্দশায় এ বিশাল গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানের প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আশরাফ সিয়ালভী (মাঃ জিঃ

www.sunnibarta.com

আঃ) উর্দূ অনুবাদ সম্পন্ন করেন। বর্তমান হুজুর ক্বেবলা মাখদুমে মিল্লাত, পেশোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ ছাহেব (দামাত বরকুতুহুমুল কুদসিয়্যাহ) ও রওনকে আহলে সুন্নাত, হাদীয়ে দ্বীনে মিল্লাত, রাহবরে তরীকৃত, আল্লামা সৈয়দ ছাবের শাহ্ ছাহেব (মাঃ জিঃ আঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিশাল গ্রন্থের চতুর্থ সংস্কনণ উর্দু অনুবাদ সহ আকর্ষনীয় মলটি ও মনোরম প্রচ্ছদ, উন্নত অফসেট কাগজে সিরিকোট দরবার শরীফ থেকে ১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

খাজা চৌহরভী (রহঃ) বিরচিত ত্রিশপারা সম্বলিত সুবিশাল গ্রন্থখানী আল্লাহর কুদরত, প্রিয় নবীর মুযিজা ও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির এক অনুপম দলীল। এ গ্রন্থ ভাষা, ভাব অলংকার, ভাষার লালিত্য, রচনাশৈলী, অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব কিছুর বিচারে অতুলনীয়। এ গ্রন্থের মর্মস্পশী আবেদন পাঠক ও শ্রোতাকে অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যায়। গ্রন্থের প্রতিটি বাক্য খোদাভীতি ও নবী প্রেমের আকর্ষনীয় বর্ণনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের তিলাওয়াতের মোহনীয় আস্বাদ পাঠককে বিমোহিত করে। ভাষায় সাবলীলতা ও অলংকার সর্বত্র সমানভাবে দীপ্তমান। অভিনব উপস্থাপনা ও অপূর্ব শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ইত্যাদির বিচারে এ বিশাল গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

মাধুর্য ও মহত্বের অপূর্ব সমাহার, ভাষা অলংকারের বিস্ময়কর প্রভাব, বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব, উলুমে এলাহীর নির্যাস, তৌহিদী মারেফেতের তীব্র আকর্ষন, বাক্য বিন্যাসে অসাধারণ ধারাবাহিকতা, সমার্থবোধ ব্যাপক শব্দের বিশুদ্ধতা, বোধগম্য, ব্যাপক ও জ্ঞানগর্ভ শব্দাবলীর আধিক্যতা, জটিল, কঠিন উচ্চতর বিষয়াবলীর অলৌকিকতা, জাগতিক, আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর পূর্ণাঙ্গিতা এ বিশাল গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তুর ধারবাহিক বিন্যাস ঃ

মা'য়ারেফে লুদুন্নির প্রস্রবন, উলুমে এলাহীর ধারক, হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহঃ) বিরচিত মাজমুওয়ায়ে সালাতওয়াত-ই-রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বিশাল গ্রন্থের বিষয়বস্তু, জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসমূল মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবন ধারা পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে উৎসারিত। এ গ্রন্থের আবেদন, বক্তব্য সমূহ শতাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব দ্বারা সমর্থিত, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় পরীক্ষা নিরীক্ষায় এ বিশাল গ্রন্থের জুড়ি নেই। অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মানদন্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এ গ্রন্থের আবেদন শাশ্বত- চিরন্তন। এ গ্রন্থও গভীর আলোচনা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে মহান রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাগত, প্রকাশগত, শাশ্বত চিরন্তন সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা সত্ত্বার অপরিসীম মহানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালতে ও বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন স্তরগত, অস্তিত্বগত, দর্শনগত, তাওহীদস্তরের বিভিন্ন প্রকারের রহস্যময় আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর সত্ত্বাগত, নুরগত, জ্ঞানগত, গুণগত, চরিত্রগত, কর্মগত, বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ রহস্যপূর্ণভাবে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব বিষয়ের তাত্ত্বিক চমৎকার আলোচনা স্থান পেয়েছে এ অদ্বিতীয় গ্রন্থে। মনোমুগ্ধকর, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণময়, মহিমাময় ও বরকতময় এ বিশাল গ্রন্থ, রচয়িতার অলৌকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খাজা চৌহরভী (রহঃ) কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ত্রিশপারায় সুবিন্যস্ত প্রতিটি পারার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু নির্ধারণ।

বিষয়বস্তুর মর্মার্থ ঃ

বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আলোক খাজা চৌহরভী (রহঃ) এ সুবিশাল গ্রন্থে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ভূমিকাসহ ৩য় সংস্করণ ছাপান হয় এবং মোর্শেদ বরহক আল্লামা তৈয়্যব শাহ (রহঃ) এর নির্দেশে তার জীবদ্দশায় এ বিশাল গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানের প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত উর্দূ সাহিত্যিক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আশরাফ সিয়ালভী (মাঃ জিঃ আঃ) উর্দূ অনুবাদ সম্পন্ন করেন। বর্তমান হুজুর ক্বেবলা মাখদুমে মিল্লাত, পেশোওয়াযে আহলে সুন্নাত, হযতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ ছাহেব (দামাত বরকুতুহুমুল কুদসিয়্যাহ) ও রওনকে আহলে সুন্নাত, আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ছাবের শাহ্ ছাহেব ক্বেবলা (মাঃ জিঃ আঃ) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিশাল গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ উর্দূ

অনুবাদসহ আকর্ষনীয় মলটি ও মনোরম প্রচ্ছদ, উন্নত অফসেট কাগজে সিরিকোট দরবার শরীফ থেকে ১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

খাজা চৌহরভী (রহঃ) বিরচিত ত্রিশপারা সম্বলিত সুবিশাল গ্রন্থখানী আল্লাহর কুদরত, প্রিয় নবীর মুযিজা ও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির এক অনুপম দলীল। এ গ্রন্থ ভাষা, ভাব, অলংকার, ভাষার লালিত্য, রচনাশৈলী, অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক দ্যোতনা সব কিছুর বিচারে অতুলনীয়। এ গ্রন্থেও মর্মস্পর্শী আবেদন পাঠক ও শ্রোতাকে অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যায়। গ্রন্থেও প্রতিটি বাক্য খোদাভীতি ও নবী প্রেমের আকর্ষনীয় বর্ণনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের তিলাওয়াতের মোহনীয় আস্বাদ পাঠককে বিমোহিত করে। ভাষার সাবলীলতা ও অলংকার সর্বত্র সমানভাবে দীপ্তমান। অভিনব উপস্থাপনা ও অপূর্ব শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, ভাবের গভীরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ইত্যাদির বিচারে এ বিশাল গ্রন্থ শ্রেষ্টত্বের আসনে অধিষ্ঠিত।

মাধুয্ ও, মহত্বেও অপূর্ব সমাহার, ভাষা অলংকারের বিস্ময়কর প্রভাব, বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব, উলুমে এলাহীর নির্যাস, তৌহিদী মারেফেতের তীব্র আকর্ষন, বাক্য বিন্যাসে অসাধারণ ধারাবাহিকতা, সমার্থবোধ ব্যাপক শব্দের বিশুদ্ধতা, বোধগম্য, ব্যাপক ও জ্ঞানগর্ভ শব্দাবলীর আধিক্যতা, জটিল, কঠিন উচ্চতর বিষয়াবলীর অলৌকিকাত, জাগতিক, আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর পূর্ণাঙ্গিতা এ বিশাল গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিন্যাস ঃ

মা'য়ারেফে লুদুন্নীর প্রস্রবন, উলুমে এলাহীর ধারক, হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহঃ) বিরচিত মাজমুওয়ায়ে সালাতওয়াত - ই- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বিশাল গ্রন্থের বিষয়বস্তু, জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসমূল মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামা এর জীবন ধারা পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে উৎসারিত। এ গ্রন্থেও আবেদন, বক্তব্য সমূহ শতাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাব দ্বারা সমর্থিত, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় পরীক্ষা নিরীক্ষায় এ বিশাল গ্রন্থের জুড়ি নেই। অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মানদন্ডের অপ্রতিদ্বন্দী এ গ্রন্থের আবেদন শাশ্বত- চিরন্তন। এ গ্রন্থের গভীর আলোচনা ও গবেষণার অবকাশ রয়েছে। এ গ্রন্থে মহান রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বাগত, প্রকাশগত, শাশ্বত চিরন্তন সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা সত্ত্বার অপরিসীম মহানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বের বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন স্তরগত, অস্তিত্বগত, দর্শনগত, তাওহীদস্তরের বিভিন্ন প্রকারের রহস্যময় আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সত্ত্বাগত, নুরগত জ্ঞানগত, গুণগত, চরিত্রগত, বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ রহস্যপূর্ণীভাবে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব বিষয়ের তাত্ত্বিক চমৎকার আলোচনা স্থান পেয়েছে এ অদ্বিতীয় গ্রন্থে। মনোমুগ্ধকর, হৃদয়গ্রাহী, প্রাণময়, মহিমাময় ও বরকতময় এ বিশাল গ্রন্থ, রচয়িতার অলৌকতা ও আধাত্মিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খাজা চৌহরভী (রহঃ) কর্তৃক রচিত এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ত্রিশপারায় সুবিন্যস্ত প্রতিটি পারার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু নির্ধারণ।

বিষয়বস্তুর মর্মার্থ ঃ

বিভিন্ন বিষয়বস্তুর আলোক খাজা চৌহরভী (রহঃ) এ সুবিশাল গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, শারীরিক ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবরণ, পরিধেয় পোষাক পরিচ্ছেদের বিবরণ, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বংশগত বর্ণনা, গুণবাচক নাম সমূহের বর্ণনা, প্রিয় নবীর সমুন্নত মানমর্যাদা, মতার ব্যাপকতা ও বিশালতা, খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদার আলোকপাত, সর্বত্র বিচরণ, মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জন, মহান প্রভুর গুণকীর্তন, প্রিয় সমুন্নত স্বভাব চরিত্রের দিক দর্শন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কর্তৃক আল্লাহর সমীপে আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা জ্ঞাপনের নূরানী কথামালা, অনুমোদন সমর্থন ও জীবন দর্শনের বিবরণ, পরকালীন ভয়াবহতার ক্রান্তিকালে তাঁর শাফায়াত লাভে তাঁরই ওসীলা ধারণ, তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্তাপন, তাঁর অনুসরণ অনুকরনের নির্দেশ পালন, আল্লাহর কুদরতী নিদর্শন ও প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর প্রতি সু সংবাদ জ্ঞাপন, তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ, খোদা প্রদত্ত প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর অসীম মর্যাদার অলৌকিক ক্ষমতার বিবরণ, তাঁর আহবানে সাড়া দান ও দরূদ সালামের ওসীলা ধারণ, তাঁর আদেশ -নিষেধের যথাযথ পালন, তাঁর সত্ত্বাগত ও দর্শনগত পরিচয় অর্জন, তাঁর নৈতিক ও চরিত্রগত অবস্থার বিশদ বিবরণ, তাঁর

সান্নিধ্য লাভ ও নৈকট্য অর্জনের গুরুত্ব জ্ঞাপন, প্রিয় নবীর ইহকাল থেকে বিদায় ও মাওলায়ে হাকিকীর সান্নিধ্য অর্জন, তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও বেহেস্তর শ্রেষ্ঠতম প্রসংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কারণ, সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্টনবী ও প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর শ্রেষ্ট উম্মতের মর্যাদার বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ অকাট্য যুক্তি নির্ভর ও প্রমাণ্য আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছেন এ বিশাল গ্রন্থ। খাজা চৌহরভী (রহঃ) এতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জীবনের বিভিন্ন দিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈকিব, জাগতিক, আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, এক কথায় রসূল জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরার প্রয়াস পান।

এ বিশাল গ্রন্থটিকে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর শানে রচিত সর্ববৃহৎ দরূদ শরীফ গ্রন্থ বলার সাথে সাথে এ কিতাবকে তাফসরি, হাদীস, ফিক্হ, উসুল, মানতিক, বালাগাত, আকাঈদ, ইতিহাস, সূফীতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, মরীয়ত, তরীক্বত দর্শন তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ তথা ইনসাইক্লোপিডিয়া বললে অত্যুক্তি হবে না।

মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে-ই-রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এমন অদ্বিতীয় গ্রন্থ, যে গ্রন্থে হাজার হাজার নবীর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতগুলো নবী সালায়হিমুস সালাম এর নাম পৃথিবীর অন্য কোন কিতাবে এক সাথে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। সালাত- সালাত ও না'তে মোস্তাফর পটভূমিতে এ কিতাব রচিত হলেও এ গ্রন্থে ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য জটিল বিশায়াদির সুষ্ঠু সমাধান, জ্ঞান বিজ্ঞারের বিভিন্ন সুক্ষাতিসুক্ষ বিষয়াদির সন্ধান মিলবে। রচয়িতা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ নূরাণী দরবারে সালাত-সালামের হাদীয়া পেশ করার পাশাপাশি হাদীসে রসূলের অসংখ্য দুর্লভ রেওয়ায়েত এ গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। মানবাত্মার পবিত্রতা অর্জন, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের নিমিত্তে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবাওে মুনাজাত বা প্রার্থনা, আবেদন করার অরেক বরকতময় প্রার্থনা সূচক দোয়া এককভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে সব দোয়াগুলো পাঠান্তে আল্লাহর দরবাবে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। বিপদাপদ, দুঃখ- বেদনা, দুঃচিন্তা অশান্তিসহ যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে এসব দোয়া সমূহ অত্যন্ত বরকত ও ফজিলতপূর্ণ মহান প্রভুর পাক আলীশান দরবাওে প্রার্থনা কবুল হওয়ার সহায়ক।

এ কিতাবে এমন সব ভাব ও বক্তব্য রয়েছে, যা অসাধারণ জ্ঞানী সুফী তাত্ত্বিক, জ্ঞানীগুণী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক ও তত্ত্বজ্ঞানী পন্ডিতজনকের হতভম্ব করে তোলে। এ কিতাবে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর সত্ত্বাগত পরিচয়, প্রকৃত গুনাবলীর মূল সৌন্দর্য ও সিফাতে কামালিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ভাবে অপূর্ব বাচনভঙ্গি অভিনব পন্থায় এমন চিত্তাকর্ষকরূপে তুলে ধরার প্রয়াস পান যা অধ্যয়নে মুসলিম বিশ্বের বহু খ্যাতনামা আলেম, পীর মাশায়েখ, তরীকতপন্থী পরিপক্ক সূফীতত্ত্ব বিদগর্ণ পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। যা রচয়িতার খোদা প্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক। যে গ্রন্থের উদাহরণ গ্রন্থর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যাবলী পরিদৃষ্ট হয়। কতিপয় নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

এ বিশাল গ্রন্থের ভাব- বক্তব্য সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাপক অর্থবোধক।

* ভাব-বক্তব্য বাক্য - বিন্যাস, শব্দ চয়ন, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।
* ভাবের গভীরতা। ভাষার প্রাঞ্জালতা অলংকারিক বিশুদ্ধতা চিনন্তন।
* আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত।
* প্রতিটি পারার প্রারম্ভ ও সমাপ্তি অভিন্ন ধারায় অনুসৃত।
* অপূর্ব বাচনভঙ্গি, রচনাশৈলীর আলোকে শ্রেষ্ঠত্বেও মানদন্ডে অধিষ্ঠিত।
* পাঠকগণকে খোদাভীতি ও নবীপ্রেমে উজ্জীবিত করে।
* প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) এর শান- মান সমুন্নত, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বেও পরিচায়ক।
* আল্লাহর সত্ত্বাগত, নূরগত, দর্শনগত, অস্তিত্বগত বিষয়ক দলীল।
* উল্লেখিত রেওয়ায়েত সমূহের সত্যতা শতাধিক কিতাব দ্বারা সমর্থিত।
* উচ্চতর সাহিত্যের মানদন্ডে নজীর বিহীন।
* ভাষা অলংকারের বিস্ময়কর প্রভাব।
* শব্দাবলী হৃদয়গ্রাহী মনোমুগ্ধকর অলৌকিকতায় ভরপুর।
* বর্ণনার ধারাবাহিকতা তথ্য ও যুক্তিনির্ভর।

আল্লাহ্ পাক প্রিয় রসুলের উপর দরূদ শরীফ পাঠের ওসীলায় মুসলিম মিল্লাতের অন্তরাত্মা আলোকিত করুন। আমিন। বেহুমরতে সৈয়্যদিল মুনসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রহস্যে ভরপুর পবিত্র কোরআন শরীফ

হোসাইন মোহাম্মদ আলমগীর (আলম জালালি)

"পড়ুন![১] আপনার রবের নামে,[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে[৩] রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন[৪]। পড়ুন![৫] এবং আপনার রবই সর্বপেক্ষা বড় দাতা,[৬] যিনি কলম দ্বারা লিখন শিক্ষা দিয়েছেন,[৭] মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।[৮]" (সুরা আল-আলাক ১-৫)

মহান আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র কোরআনের অর্থ ও রহস্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আমাদের দাবী হচ্ছে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমগ্র জাহানের রব, আর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত (রহমত) ও পবিত্রতম সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক তাঁহার প্রিয় হাবীব ও অন্যান্য নবী-রাসুলগণ এবং তাহাদের সরদার আমাদের আকা হযরত সায়্যিদিনা রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহীনশাহে বনী আদম মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উনার আওলাদ ও সাহাবী এবং সকল সালেহীন গণের সবার উপর।

মহা পবিত্র আল-কোরআনে মহান আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে এবং ফেরেশতা সকল-কে নিয়ে সদা সর্বদা কি করিতেছেন! এবং ঈমানদারগণকে (মুসলমানদের-কে নয়) আমল করার কি হুকুম দিয়েছেন তা সুরা আহ্‌যাব-৫৬ নং আয়াতে সু-স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

হযরত মা আয়শা সিদ্দীকাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে। নবুয়ত প্রকাশের সময় নিকটবর্তী হলে হুজুর নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক, সিয়্যাহে আফলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য সত্য স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা দিনের আলোর মত উনার জীবনে প্রতিভাত হতো। এক টুকরো দৃশ্যমান নূর তাঁহার অন্তরে সর্বদা ভাস্বর হয়ে থাকতো। আল্লাহর নবী ওহী প্রাপ্তির আগে আস্তে আস্তে তিনি নির্যনতা প্রিয় হয়ে ওঠেন।

অতঃপর হুজুর জাবাল-ই-নূর এর গার-ই-হেরায়, গুহায় চলে যেতেন। অর্থাৎ একাকীত্বে মহান আল্লাহর ধ্যান ইবাদতের মশগুলে সময় কাটাতেন। যখন শাহীন শাহে বনীআদম নূরে মুজাস্‌সাম নবীয়ে মুকাররাম, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই দুনিয়াবী অর্থাৎ জাহেরী জিন্দিগীর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছর ৬ (ছয়) মাস ১২ (বার) দিন, ১৭ই বা ২১শে রমজান সোমবার সাহরীর সময় ঐ গুহায় আল্লাহর দূত ফেরেস্তা জিব্রাইল আমিন পবিত্র কোর-আনের পবিত্র আয়াত নিয়ে হাজির হলেন। আর আরয করলেন হুজুর পড়ুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি পড়ছি না (আমি পড়িনা) অতপর জিব্রাইল আমিন হুজুরকে পর পর দুবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং একই আরয করলেন। হুজুর একই জবাব দিলেন। অতঃপর তৃতীয়বার জিব্রাইল আমিন হুজুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন এবং সুরা ইকরার পাঁচটি আয়াত পড়ে শুনালেন। -রূহুল বয়ান (বিঃ দ্রঃ নূরুউল্ল্যাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের নূরাণী শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ উল্লেখ্য যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "আমি পৃথিবীতে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।")

যখন থেকে পবিত্র কোর-আন নাজিল শুরু হয় তখন থেকেই আল্লাহর প্রিয় রাসুল মুহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য পারদর্শী সাহাবীদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে হযরত যায়েদ বীন সাবেত রাদিয়াআল্লাহু আনহু ছাড়া আরো বিশিষ্ট ৪২ জন সাহাবী এ পবিত্র কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রথম খলিফায়ে আজম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়া আল্লাহু আনহু এর সময়ে হযরত যায়দ ইবনে সাবেত রাদিয়াআল্লাহু আনহু পবিত্র কোরআনে মোট ১১৪ (একশত চৌদ্দ) টি সুরা নির্ণয় করেন। কোন কোন সুরার আয়াত সম্বলিত তথ্য স্বয়ং আল্লাহর হাবিব

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিজ থেকে পাওয়া যায়। যেমন-সুরা ফাতেহার ৭ (সাত) আয়াত এর যে কথা রয়েছে তা তিনি সরাসরি নিজেই বলেছেন। সুরা মুলক- এর ৩০ (ত্রিশ) আয়াতের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র আল-কোরআনে ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, হযরত জিব্রাইল আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাতামুন্ন আম্বিয়া রাসুলে আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছেন, অমুক আয়াতটি সুরা বাকারার ২৮০ নং আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করুন অন্য এক রেওয়াতে তিনি সৈয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন্নবীনিয়ান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সুরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন।

সম্ভবত সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যুগেই পবিত্র কোরআনের আয়াত গণনার কাজটি শুরু হয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতের সাথে ২০ (বিশ) রাকাত তারাবীর নামজের (বেদাতে হাসানা) প্রচলন করেন এবং তারাবীর নামাজের প্রতি রাকাতে ৩০ (ত্রিশ) আয়াত করে কোরআন তেলাওয়াত করার নিয়ম জারি করেছিলেন।

অন্যান্য সাহাবা আকরামদের মধ্যে হযরত ওসমান জ্বিন-নূরআইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবুদ্ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রমুখ সম্মানিত সাহাবিগণ পবিত্র কোরআনের আয়াত সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। তবে সাধারণত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহুর গণনাকে এ ব্যাপারে বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়।

পবিত্র আল-কোরআনের প্রথম মোফাসসের হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল্লাহর বিজ্ঞানময় পবিত্র কোরআনের প্রথম সংকলক হচ্ছেন হযরত ওসমান জ্বিন নূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু।

অনেকের মতে আরবী লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন মোয়ামের ইবনে মুরার, আসলাম সোদরাহ এবং আমর ইবনে জাদারা নাম ঐ তিন জন। তাঁদের মধ্যে মোয়ামের হরফের আকৃতি আবিষ্কার করেন। পড়ার মাঝে থামা, শ্বাস নেয়া এবং একত্রে মিলিয়ে পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও তিনি আবিষ্কার করেন। আরেক বর্ণনায় হযরত আবু সুফিয়ানকে নোকতার আবিষ্কারক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আরবদের মধ্যে আগে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন করার রীতি প্রচলিত ছিল না। আরবীরা নোকতাবিহীন অক্ষর দ্বারা লেখা লেখী করতো। এতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হতো না। কেননা পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত কোনদিনই অনুলিপি নির্ভর ছিল না। কোরআনের হাফেজদের তেলাওয়াত থেকেই লোকেরা পবিত্র কোনআন শরীফ তেলাওয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতো। কিন্তু পরে অনারব লোকদের প্রয়োজনে আরবী বর্ণমালায় নোকতা সংযোজন বা উত্তম বেদাত (বেদাতে হাসানা) করা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে।

পবিত্র কোরআনুল করীমে হরকতসমূহ, সর্বপ্রথম নোকতার (উত্তম বেদাতের) কে প্রচলন করে ছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট আলেমদের মতে বিখ্যাত ব্যাকারণবিদ এবং তাবেয়ী হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উত্তম বেদাতের (নতুনত্বের) আনজাম দেন। অনেকেই একমত পোষণ করেন যে হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উত্তম কাজটি জ্ঞানের দরজা হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নির্দেশেই সম্পাদন করেছেন।

নোকতার মতো প্রথম অবস্থায় পবিত্র কোরআনুল করীমে হরকত বা যের, যবর, পেশ ইত্যাদি ছিল না। সর্বপ্রথম কে এই উত্তম বেদাত হরকতের প্রবর্তন করলেন এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের মতে সর্বপ্রথম হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী পবিত্র কোরআনের

www.sunnibarta.com

হরকতের এই উত্তম বেদাতের (নতুনত্বের) প্রথা প্রচলন বা প্রবর্তন করেন। অনেকেরই অভিমত হচ্ছে যে, বাগদাদের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই কাজটি ইয়াহইয়া বিন ইয়াসার এবং নসর আসেম লাইসীর দ্বারা সম্পন্ন করিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য অভিমত হচেছ যে, হযরত আবুল আসাদ দুয়েলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন শরীফের জন্য হারাকাতের উত্তম বেদাতের প্রচলন আবিস্কার করেছিলেন। পরে খলীফা বীন আহম্মদ হামযা নোকতার সাথে তাশদীদের চিহ্ন (বেদাতে হাসানা) প্রচলন করেন। পবিত্র নূরানী কোরআনুল করীমে হারকাত ও নোকতার সংখ্যা মোট-যবর= ৫৩,২২৩টি, যের= ৩৯,৫৮৩টি, পেশ= ৮,৮০৪টি, মদ= ১,৭৭১টি, তাশদীদ =১,২৭৪টি, নোকতা= ১,০৫,৬৮৪টি।

বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা যেমন-আলিফ= ৪৮,৮৭২টি, বা= ১১,৪২৮টি, তা= ১,১৯৯টি, ছা= ১,২৭৬ টি, জীম= ৩,২৭৩টি, হা= ৯৭৩টি, খা= ২,৪১৬টি, দাল= ৫,৬০২টি, যাল= ৪,৬৭৭টি, রা = ১১,৭৯৩টি, যা= ১,৫৯০টি, সীন= ৫,৯৯১টি, শীন= ২,১১৫টি, ছোয়াদ= ২,০১২টি, দোয়াদ= ১,৩০৭টি, তোয়া= ১,২৭৭টি, যোয়া= ৮৪২টি, আঈন= ৯২২০টি, গাঈন= ২,২০৮টি, ফা= ৮,৪৯৯টি, ক্বাফ= ৬,৮১৩টি, কাফ= ৯,৫০০টি, লাম= ২,৪৩২টি, মীম= ৩৬,৫৩৫টি, নূন= ৪০,১৯০টি, ওয়াও= ২৫,৫৪৬টি, হা= ১৯,০৭০টি, লাম-আলিফ= ৩,৭৭০টি, ইয়া=৪৫,৯১৯টি।

হযরত সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। উনার গণনা মতে পবিত্র কোরআনের অক্ষর হচ্ছে= ৩,২২,৬৭১টি। তাবেয়ীদের মাঝে মোজাহেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর গণনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের অক্ষর হচ্ছে= ৩,২১,১২১টি। তবে সাধারণভাবে কোরআনের অক্ষর= ৩,২০,২৬৭টির সংখ্যাই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পবিত্র কোরআনের শব্দ সংখ্যা হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী= ৭৬,৪৩০টি, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক= ৭০,৪৩৯টি, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক= ৭৬,২৫০টি, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে= ৮৬,৪৩০টি।

মহান আল্লাহের পবিত্র কোরআনের আয়াতের সংখ্যা হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর মতে= ৬,৬৬৬টি। হযরত ওসমান জ্বিন-নূরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে= ৬২৫০টি, হযরত মাওলা আলী করিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে = ৬,২৩৬টি, হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে= ৬,২১৮টি, মক্কাবাসী গণের মতে= ৬,২১২টি, বসরাবাসীগণের মতে= ৬,২২৬টি, ইরাকবাসীগণে মতে= ৬,২১৪টি, কান্‌যুল ঈমানে=৬,২৩৮টি, বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণের মতে হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার গণনায় বেশী যুক্তিযুক্ত ও প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কোরআনের নোসফা সমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুনলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না।

মহান নূরানী কিতাব বা বিজ্ঞানময় পবিত্র কোরআনে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে জানিয়েছেন, জান্নাতের ওয়াদা= ১,০০০বার, জাহান্নামের ভয়= ১,০০০ বার, নিষেধ= ১,০০০ বার, আদেশ= ১,০০০ বার, বিভিন্ন উদাহরণ= ১,০০০ বার, বিভিন্ন কাহিনী= ১,০০০ বার, হারাম= ২৫০ বার, হালাল= ২৫০ বার, মহান আল্লাহর পবিত্রতা= ১০০ বার, বিবিধ ঘোষণা এসেছে ৬৬বার।

পবিত্র কোরআনের নোসখায় প্রথম দিকের 'আখমাস' এবং 'আশারের' আলামত পরবর্তী যুগে এসে পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং অন্য একটা বেদাতের (নতুনত্বের) ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। এ নতুন (বেদাত) পদ্ধতিটির চিহ্নটিকে রুকু বলা হয় সমগ্র কোরআন মজীদে মোট ৫৫৮টি (কানযুল ঈমান) কোন কোনটিতে ৫৪০টি রুকু রয়েছে। প্রতি রাকাতে যদি এক রুকু করে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তাহলে পবিত্র বরকতময় রমযান মাসের প্রতিরাত্রে ২০ (বিশ) রাকাত তারাবীর নামাজে সাতাশের রমজানে পবিত্র কদরের রাত্রিতে নূরী কোরআনের তেলাওয়াত খতম বা শেষ হয়ে যায়।

www.sunnibarta.com

পবিত্র কোরআন শরীফ আল্লাহ তা'আলা প্রায় ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি বিভিন্ন পবিত্র নামে অভিহীত করেছেন যেমন- কিতাবুল মুবীন, নূর, হেদায়াত, রহমাত, ফোরকান, শেফা, মাওয়েযাত, যকরুম মোবারক, হেকমাত, মোহাইমেন, হাকীম, হাবল, কাওল, আহসানুল হাদীস মোতাশাবেহাম মিনাল মাছানী, তানযীল, রুহ, ওয়াহী, বাছায়ের, বায়ান, ইলম, তাযকেরাহ, ছেদ্‌ক, আমর, বুশরা, মাজীদ, আযীয, বালাগ, বাশীর, নাযীর, ছুহুক, ইত্যাদি। উক্ত কোরআন শরীফ 'জুয' বা পারা বিভিন্ন নামে ত্রিশটি ভাগে বিভক্ত। এই ত্রিশটি পারায় বিভক্ত হওয়ায় কোরআন তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অনেক সুন্দর ছন্দময় ভাবে পাঠ করা যায়।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মোসনাদে আহম্মদে রাদিয়াল্লাহু আনহু গণের বর্ণনা অনুযায়ী একদিন বনী সাফাবী গোত্রের এক প্রতিনিধি দল মহান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে খেদমতে হাজির হলে তিনি তাহাদের কাছে আসতে কিছু বিলম্ব হয়। এই দেরী হওয়ার কারণ উল্লেখ করে মখলুকের নবী দুজাহানের আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন আমি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে ছিলাম, আজকের দিনে নির্ধারিত অংশ (মনযিল পর্যন্ত) শেষ করতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

সাতটি মঞ্জিলে কিতাবুল্লাহ সমাপ্ত। **প্রথম মনযিল** সূরা আল ফাতেহা থেকে আন নেসা, **দ্বিতীয় মনযিল** সূরা আল মায়েদা থেকে সুরাত আততাওবা, **তৃতীয় মনযিল** সুরা ইউনুস থেকে সুরা আন নাহল, **চতুর্থ মনযিল** সুরা বনী ইসরাঈল থেকে সুরা আল ফোরকান, **পঞ্চম মনযিল** সূরা আশ শোয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন, **৬ষ্ঠ মনযিল** সূরা আস সফফাত থেকে সূরা আল হুজরাত, **সপ্তম মনযিল** সূরা ক্বাফ থেকে সূরা আন নাস পর্যন্ত।

মহান সৃষ্টিকর্তা তাহার প্রেরিত পবিত্র কোরআন নাযিলের মোট সময় প্রায় ২২ বছর ০৫ মাস। উক্ত কোরআনে ১০ (দশ) জন মহিলার নাম বিভিন্ন সূরায় প্রকাশ করেছেন এবং ২৫ (পঁচিশ) জন নবী ও রাসুল গণের নাম উল্লেখ করেছেন।

সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোরআনে নিম্নে উল্লেখিত ধ্বংপ্রাপ্ত জাতিসমূহের নাম আমাদের উদাহরণের জন্য আল্লাহপাক প্রকাশ করেছেন, যেমন - আদ, সামুদ, লূত, নূহ, সাবা, তুব্বা, বনী ইসরাঈল, আসহাবে কাহফের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি, আস্‌হাবুস সাবাত, আস্‌হাবুল কারিয়াহ্‌, আসহাবুল আইকা, আসহাবুল উখদুদ, আস্‌সাহাবুল রাস, আসসাহাবুল ফিল।

পবিত্র কোরআন শরীফে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন দুশমনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সে হচ্ছে আবু লাহাব। ওহী নাযিল হওয়ার পর যদি আবু লাহাব ইসলাম ধর্ম কবুল করত তাহলে কোরআন শরীফের আয়াতটি মিথ্যা প্রমাণিত হত, কিন্তু লাহাব ইসলাম ধর্ম কবুল করেননি, তাই কোরআন শরীফের বানী চিরকালের জন্য সত্য হয়েই রয়েছে এবং থাকিবে।

'ফী আদনাল আরদ' বলে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গোটা ভূ-মন্ডলের যে স্থানটিকে সর্বনিম্ন অঞ্চল বলেছেন তা ছিল- সিরিয়া, ফিলিস্তিান ও জর্দানের পতিত 'ডেড সী' এলাকা, এখনও ওই পানিতে মানুষ ডুবে না। কিছুদিন আগে আবিস্কৃত ভূ-জরিপ অনুযায়ী এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই এলাকাটা সারা দুনিয়ার মধ্যে আসলেই নিম্নতম ভূমি। উহা সী লেবেল থেকে ৩৯৫ মিটার (প্রায় ১২৯৫ ফুট) নিচে। এই স্থানটি যে গোটা ভূখন্ডের সবচেয়ে নিচু জায়গা এটা ১৪ শ' বছর আগের সাধারন মানুষ কি করে জানবে।

পবিত্র বিজ্ঞানময় কোরআন শরীফের আরেকটি বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে- লোহা ধাতুটির বিবরণ কোরআনের সূরা 'আল হাদীদ'-এ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-আমি লোহা নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে শক্তি ও মানুষের জন্য প্রভূত কল্যাণ। আধুনিক বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, লোহা উৎপাদনের জন্য যে ১৫ (পনের) লক্ষ সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন তার কোন স্বাভাবিক উপকরন আমাদের পৃথীবিতে নেই। এইটা একমাত্র সূর্যপৃষ্ট তাপমাত্রা দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। এই উল্লেখিত সূরার আরেকটি অংকগত মোজেযাও রয়েছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সূরা আল-

হাদীদ কোরআনের ৫৭ (সাতান্ন) তম সূরা। আরবীতে সূরা 'আল-হাদীদ' এর সংখ্যাগত মান হচ্ছে ৫৭ (সাতান্ন)। শুধু আল-হাদীদ শব্দের অংকগত মান হচ্ছে ২৬ (চাব্বিশ) আর লোহার আণবিক সংখ্যার মানও হচ্ছে ২৬ (ছাব্বিশ)।

মহান আল্লাহ পাক তাঁহার পাক কোরআনে সূরা আল-ইমরান এর ৫৯ (উনষাট) নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতার মাধ্যম (উছিলা) ছাড়া সৃষ্টি হযরত আদম সফিউল্লাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, কোরআন শরীফে হযরত ঈসা আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নামটি যেমন ২৫ (পচিঁশ) বার এসেছে, তেমনি হযরত আদম আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নামটিও এসেছে ২৫ (পচিঁশ) বার। পবিত্র হেকমাতুল কিতাবে অংকগত মোজেজাহ্ এখানেই শেষ নয়। ঈমান ও কুফর শব্দ দুটিও ২৫ (পচিঁশ) বার করে সমপরিমানে বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বানী গুলো যে, মানুষের নয় তা বোঝা যাচ্ছে উক্ত নামের সংখ্যার সমতা দেখেও। উহাতে ২৫ (পঁচিশ) জন নবী ও রাসূল গণের নাম উল্লেখ আছে।

পবিত্র কোরআনের ০৯ (নয়) টি মীম অক্ষর সম্বলিত সূরা হচ্ছে সূরা আল কাফেরূন, কোনো মীম নেই যে সূরায় তা হচ্ছে সূরা 'আল কাওসার'। উক্ত নূরানী কিতাবে 'বিসমিল্লাহ' নেই-এমন সূরা হচ্ছে সূরা 'আত তাওবা', দুই বার 'বিসমিল্লাহ' আছে এমন সূরা হচ্ছে সূরা 'আন নামল'।

পবিত্র কোরআন পাকে ২০টি স্থান এমন রয়েছে, ঐ সব যায়গায় 'যের', 'যবর' ও পেশ ইত্যাদি পাঠ করার সময় সামান্যটুকু অসতর্কতা অবলম্বন বা ভূল করে পড়লে অর্থের পরিবর্তন হয়ে 'কুফরী কলেমা পাঠ হয়ে যায়। উক্ত নূরানী কিতাব কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল করে পড়লে বা আন্তরে উহার প্রতি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিলে তাহার ঈমান থাকিবে না।

পবিত্র নূরানী কিতাব ফোরকানে উল্লেখ আছে জান্নাতের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতের সংখ্যা হচ্ছে ৮ (আট) আর জাহান্নামের সংখ্যা হচ্ছে ৭ (সাত)। এখানে সুদ এবং বাণিজ্যের সংখ্যাটি অসম যেমন- কোরআনে এ শব্দ দুটির একটি এসেছে ৬ (ছয়) বার, অন্যটি এসেছে ৭ (সাত) বার। সূরা 'আরাফ' সূরা 'আল-কাল্‌ব' এর আয়াতে কেতাবুল মুবীন এর অস্বীকার কারীকে কুকুর বলে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মোট ৫ (পাঁচ) বার।

'সাবয়াতুল আইয়াস' মানে ৭ (সাত) দিন। 'সাবয়া সামাওয়াত' অর্থাৎ ৭ (সাত) আসমান। 'খালকুস সামাওয়াত' অর্থাৎ আসমানসমূহের সৃষ্টি আশ্চার্যের বিষয় হল উল্লেখিত কথা গুলি পবিত্র কোরআনে ৭ (সাত) বার করে এসেছে। 'আত তাইয়েব' মানে পবিত্র, 'আল খবিস' মানে অপবিত্র। সমগ্র তানযিনাল কিতাবে এই দুইটি আয়াতের শব্দ মোট ৭ (সাত) বার করে, অর্থাৎ একই সংখ্যায় নাযিল হয়েছে।

এই মোহাইমেনুল কিতাবে 'গরম ও ঠান্ডা' যেহেতু দুটি বিপরীত মূখী ধাতু, তাই এই শব্দ গুলি ৫ (পাঁচ) বার করে সমান সংখ্যায় এসেছে। দুনিয়া ও আখিরাত এই সংখ্যাও ১১৫ বার করে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। আরবী ভাষায় 'কূল' অর্থাৎ 'বলুন' আর জবাবে বলা হয় 'কালু' অর্থাৎ 'বললো' সমগ্র রুহুল কোরআনে এই শব্দগুলি সমান সংখ্যক ৩৩২ বার করে এসেছে।

'মালাকূল' কিংবা 'মালায়েক' মানেই ফেরেশতা বা ফেরেশতারা এই শব্দ গুলো এসেছে ৮৮ বার। একইভাবে চিরশত্রু 'শয়তান' কিংবা 'শায়াতীন' এ শব্দ গুলোও এসেছে ৮৮ বার।

পবিত্র ৩০ পারা কোরআনে 'ইয়াওমূন' শব্দের বহুবচন 'আইয়্যাম' মানে দিকসমূহ, এই শব্দটি এসেছে ৩০ বার। আরবী ভাষায় 'চাঁদ' হচ্ছে মাসের সূত্র সূচক, গড়ে বছরে প্রতি মাসে ৩০ দিন, এটাই চান্দ্র বছরের হিসাব। আরও হতবাক হতে হয় যখন দেখি চাঁদের আরবী প্রতিশব্দ 'কামার' শব্দটি কোরআনে এসেছে ৩০ বার।

ইয়াওমন অর্থাৎ দিন, সমগ্র তাযকেরাতুল কিতাবে এই শব্দটি ৩৬৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এক বছরে ৩৬৫ দিন হয় উহা সবারই জানা। (চাঁন্দ্র বছরে দিন গণনায় প্রায় কয়েকদিন কম হয়, যেহেতু চাঁদের মাস ৩১ (একত্রিশ) দিন হিসাবে নাই)।

'শাহরুন' মানে মাস কোরআন মাজীদে এ শব্দটি এসেছে ১২ বার। 'সানাতুন' মানে বছর কোরআনে এ শব্দটি এসেছে ১৯ বার। কারন হিসাবে আমরা সম্প্রতি আবিস্কৃত গ্রীক পন্ডিত মেতনের 'মেতনীয়বৃত্তের' কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনিই প্রথম এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন যে, প্রতি ১৯ বৎসর পর সূর্য ও পৃথিবী প্রায় পাশাপাশি একই অবস্থানে থাকে।

পবিত্র কোরআনে 'ফুজ্জার' অর্থাৎ পাপি আর বিপরীত শব্দ 'আবরার' অর্থাৎ পূণ্যবান শব্দটি দ্বিগুন হয়েছে। অর্থাৎ পাপী ৩ বার আর পূণ্যবান ৬ বার। এর কারণ হচ্ছে শাস্তির তুলনায় পুরুস্কারের পরিমান আল্লাহ তা'আলা সব সময় দ্বিগুন করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আর 'আযাব' শব্দটি যতবার এসেছে 'সওয়াব' শব্দটি তার দ্বিগুন এসেছে। অর্থাৎ আযাব ১১৭ বার, সওয়াব ২৩৪ বার।

কল্যানময় ফোরকানে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করলে তিনি তার বিনিময় অধিক বাড়িয়ে দেবেন। সম্ভবত এই কারনেই কোরআনে 'গরীবি' শব্দটি এসেছে ১৩ বার, আবার তার বিপরীতে 'প্রাচুর্য' শব্দটি এসেছে ২৬ বার।

হায়াত ও মওত এর কথা সমান সংখ্যায় এসেছে ১৬ বার। হেদায়াত ও রহমত বর্ষিত হয় এসেছে ৭৯ বার। যাকাত ও বরকত এসেছে ৩২ বার। 'আবদ' মানে গোলামী আর 'আবীদ' মানে গোলাম এই উভয় শব্দ এসেছে ১৫২ বার করে। মানুষ সৃষ্টি এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য (এবাদাত) তাও এসেছে ১৬ বার। নেশা করলে মাতাল হয় ৬ বার করে এ দুটি শব্দ এসেছে।

'ইনসান' অর্থাৎ মানুষ শব্দটি কোরআনে এসেছে ৬৫ বার। এবার ইনসান বানাবার উপকরণ গুলোকে কোরআনের বিভিন্ন যায়গা থেকে যোগ মিলিয়ে দেখা যায় যেমন- **প্রথম** উপাদান 'তোরাব' বা মাটি এটি এসেছে ১৭ বার, **দ্বিতীয়** উপাদান 'নুতফা' বা জীবনকণা এটি এসেছে ১২ বার, **তৃতীয়** উপাদান 'আলাক' বা রক্তপিন্ড এটি এসেছে ৬ বার, **চতুর্থ** উপাদান 'মোদগা' বা মাংসপিন্ড এটি এসেছে ৩ বার, **পঞ্চম** উপাদান 'এযাম' বা হাড় এটি এসেছে ১৫ বার এবং **ষষ্ঠ** বা শেষ উপাদান হচ্ছে 'লাহাম' বা গোশত এ শব্দটি এসেছে ১২ বার। কোরআনের উল্লেখিত (সূরা হজ্জ-৫) এই উপাদানগুলো যোগ করলে যোগ ফল হবে ঠিক ৬৫। আর এসব উপাদান দিয়ে যে ইনসান বানানো হয়েছে তাও ঠিক ৬৫ বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পাক বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ হেকমাতুল-কোরআনের সূরা 'আল-ক্বামার' এর প্রথম যে আয়াতটিতে চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার সাথে কেয়ামতের আগমন প্রত্যাসন্ন কথাটি বলেছেন আরবী বর্ণমালার আক্ষরিক মান হিসাব করলে তার যোগফল হয় = ১৩৯০, আর এই সংখ্যাটি ১৩৯০ হিজরী বা ১৯৬৯ (খৃষ্টাব্দে) সালেই মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরন করে। জানিনা উহা পবিত্র কোরআনের কোন মোজেজা, না তো এমনিই এক ঘটনাচক্র, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এই মহান সৃষ্টিতে তো ঘটনাচক্র বলতে কিছু নেই। এ কারনেই হয়তো মানুষ চাঁদে অবতরনের সালের সাথে কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি সংখ্যামানের এই বিস্ময়কর মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটাই হল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য **খাতামুন্ন আম্বিয়া, তাজেদারে রিসালাত, শাহীন শাহে নবুয়াত, মাখযানে জুদ ওয়া সাখাওয়াত, পায়করে আযমত ওয়াশাফায়াত, মাহবুবে রাব্বুল ইজ্জত, মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর নাযিল কৃত রহস্য ভরপুর লৌহোমাহফুজে সংরক্ষিত পবিত্র কোরআন শরীফ।** আমিন।

সর্বশেষ ওহীঃ- "এবং ভয় কর ওই দিনকে, যে দিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারা-২৮১)।

* "আজ আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলাম-কে দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মা-ইদাহ্- ৩ আংশিক)।

(সংক্ষিপ্ত ও সংকলিত)

ধৈর্যের প্রতীক হযরত যয়নব বিনতে ফাতেমা (রাঃ আন্‌হা)

সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

যাহারা কাননের এক সুবাসিত ফুল হযরত জয়নব বিনতে আলী (রাঃ)। তিনি তাঁর প্রিয় ভাই হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর সাথে কারবালাতে সফরসঙ্গী হয়ে ধৈর্য্য ও ত্যাগের যে মহান পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন- তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (আঃ) এর চার ভ্রাতুস্পুত্রের শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়ার (রাঃ) এর দুই পুত্র সাইয়্যিদা জয়নবের কলিজার টুকরাদ্বয় মুহাম্মদ ও আউনের পালা আসলো। 'বাগে যাহরা'র দুটি জান্নতী ফুল এগিয়ে এসে আরয করলেন- মামাজান, আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হবার অনুমতি দিন। ইমামে পাক বললেন, না তোমাদের জন্য অনুমতি নেই। তোমরা তোমাদের মায়ের সাথে থাক। মুহাম্মদ ও আউন বললেন- মামাজান,আম্মাজানের নির্দেশ এটাই। দেখুন, উনি ও সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ইমামে পাক নিজ সহোদরা সাইয়্যেদা জয়নবকে বললেন-প্রিয় বোন আমার, একটু খেয়াল কর। আমি কোন চোখে ফুলের মত বাচ্চাদের বুক তীর-বর্শায় বিদ্ধ হতে দেখব? সাইয়্যেদা যয়নব বললেন- প্রিয় ভাই আমার ! আমি ক্ষুদ্র বলেই কি আমার এ সামান্য উপহারটুকু গ্রহণ না করেন, তবে আম্মাজান ফাতিমা যাহরাকে কি জবাব দেব- যখন তিনি প্রশ্ন করবেন, বেটি, ঐ কঠিনতম সময়ে তুমি কি নজরানা দিয়েছিলে- যখন সারওয়ারে কাউনাইনের শাহজাদার সমীপে সবাই জানের নজরানা পেশ করেছিল? আমার দেবার মত এ দুটি সন্তানই শুধু আছে। দুজনকেই আপনার চরনে উৎসর্গ করলাম। ইমামেপাক সজল নয়নে নিজের বোনকে দেখতেন। হৃদয় চূর্ণ - বিচূর্ণ হয়ে গেল । ভাগ্নেদ্বয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিদায় দেবার সময় সাইয়্যেদা যয়নব (রাঃ) তাকিয়ে রইলেন- তাঁর নয়নের তারা দুটি ইয়াজিদী যজ্ঞে আত্মহুতি দিতে চিরতরে চলে যাচ্ছে। তাঁরা যাবার সাথে সাথেই তো নেকড়ের পালের মত দুশমনেরা ঝাঁপ দেবে এবং ওদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ছাড়বে। কিন্তু ধৈর্যশীরা মা নিজ বুকে হাত রাখলেন- আর আসমানের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন "মাওলা" তোমার সন্তুষ্টিতে আমিও সন্তুষ্ট। হযরত জাফর ত্বাইয়ার (রাঃ) এর পৌত্র এবং শেরে খোদা মাওলা আলী (রাঃ) এর দৌহিত্রদ্বয় রনাঙ্গনে এমন কৃশলীর পরিচয় দিলেন যে, শত্রুর সারিতে রীতিমত শোরগোল পড়ে গেল। শেষতক বহু ইয়াজিদীকে মেরে কেটে নিজেরাও তলোয়ারের নিশানা হয়ে শাহাদাতের অমিত সুধা পান করলেন। ইমামে পাকের সহযোগীরা তাঁদের লাশগুলো এনে তাঁবুর পাশে রাখতেন। ইমামেপাক বললেন, নাও বোন যয়নব ,তোমার কুরবানী মঞ্জুর হয়ে গেছে। মা যখন কাঁটাছেড়া লাশগুলো দেখলেন, তখন লাশের উপর আছড়ে পড়ে বলতে লাগতেন, বাছারা আমার ! হায় ! তোমাদের জায়গায় যদি আমি তোমাদের মা যেতে পারতাম!

সাইয়্যেদা যয়নব (রাঃ) এর নিজ স্বামী মদিনায় অবস্থানকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাইয়ার (রাঃ) এর কাছে দু'পুত্র শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌছলে অনেকেই তাঁকে সমবেদনা জানাতে আসলেন। তিনি বললেন, খোদার শোকর যে, তিনি হুসাইনের দুঃখে ও তাঁর শাহাদাতের পূন্যধারায় (পুত্রদ্বয়ের মাধ্যমে) আমাকে ও শরীক করলেন।

কারবালা প্রান্তরে একে একে সকল সঙ্গী সাথীদের শাহাদাতের পর ইমামে পাক যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। কারবালার মজলুম ইমাম হুসাইন (আঃ) ডানে- বামে চোখে বুলালেন। নিবেদিত প্রাণ সহচরদের কেউ নেই। যারা ঘোড়ার আরোহন করার সময় পা- দানি এগিয়ে দিতো তাঁরা আজ কোথায়? তখন হযরত যয়নব (রাঃ) দেখলেন যে, ভাইকে সওয়ার করিয়ে দেবার মতও কেউ নেই। বললেন "হে রাসুল- কাঁধের সওয়ারী, রেকার ধারণের সেবায় আজ অন্য কেউ নেই বলে নিরাশ হবেন না। রাসূলের এ নাতনী আপনার খেদমতে হাযির"। এবার কারবালার তাজেদার ইমাম হোসাইন (রাঃ) দুলদুলে সওয়ার হয়ে ময়দানে রওয়ানা হলেন। সত্য, ন্যায় ও আল্লাহর দ্বীণকে পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সাইয়্যেদুনা ইমাম হুসাইন (রাঃ) তিন দিনের পিপাসার্ত অবস্থায় বাতিল বেহায় বদ নসীবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহদাত বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে.... রাজিউন)।

এরপর দূরাচার ইয়াজিদী সৈন্যরা যখন আহলে বাইতের নারী ও শিশু কিশোরদের বন্দী করে কুফা অভিমুখে যাত্রা করে, তখন পর্যন্ত ইমামে পাকের কন্যা ও ভগ্নিদের সামনে কাফন-দাফন বিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছিলেন তাঁদেরই

প্রিয়জনদের পবিত্র লাশগুলো। বিদায় মূহুর্তে সাইয়্যেদা জয়নব (রাঃ) অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হৃদয়ে কান্না করতে করতে বরেছিলেন, " হে রাসুলুল্লাহ (দঃ) ! আপনার উপর আল্লাহর তায়ালা ও আসমানী ফেরেশতাদের দুরুদ ও সালাম। দেখুন, আপনার নাতী হুসাইন কর্তিত দেহ ও রক্ত- ধুলায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছেন। হে মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ), আপনার কন্যারা আজ কয়েদি হয়েছে, আপনার সন্তানেরা আজ নিথর, শহীদ অবস্থায় পড়ে আছেন, বাতাস তাঁদের উপর ধুলা ছিটাচ্ছে, দেখুন। (বর্ণনাকারী বলেন)- খোদার কসম, তাঁর করুণ সে আর্তি কাঁদিয়েছে শত্রু- মিত্র সবাইকে। কুফাবাসীদের সম্মুখে হযরত যয়নব যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল যে, তাঁর কণ্ঠ দিয়ে যেন তাঁর পিতা আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ) এর বাণীগুলো নিঃসৃত হচ্ছে। বন্দী আহলে বাইতকে যখন ইবনে যিয়াদের সামনে আনা হয়, তখন যালিম ইবনে যিয়াদ ইমাম যয়নুল আবেদীনকে দেখে তাঁকেও কতল কারার হুকুম দেয়। এ সর্বনাশ হুকুম শুনে সাইয়্যিদা যয়নব হাহাকার করে উঠলেন। যয়নুল আবেদীনকে কেছে টেনে বুকে চেপে ধরে বললেন, ইবনে যিয়াদ; আমাদের রক্তে এখানো কি তোমাদের তৃ মিটেনি? আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের কাছে এই একটি প্রার্থনাই করছি- যদি এ কিশোরকে হত্যা করতেই চাও, তবে আমাকের তাঁর সাথে কতল করে দাও। ইবনে যিয়াদ অনেকক্ষণ ধরে ফুফু ভাইপোর চেহারা নিরীক্ষণ করে বলল- মহিলাদের সাথে থাকার কারণে এ বালককে ছেড়ে দাও!

উন্দী আহলে বাইতকে যখন দামেস্কে ইয়াজিদেও দরবারে নীত হলো- তখন সিরিয়ার এক দূরাচার ফাতিমা বিনতে হুসাইন (আঃ) এর দিকে ঈশারা করে বলল- আমিরুল মোমেনীন ! এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। এ মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হযরত ফাতিমা ভয় পেয়ে ফুফুকে ঝাপটে ধরলেণ। সাইয়্যিদা যয়নব (রাঃ) গর্জে উঠে ঐ সিরিয়কে বললেন- বাজে বকছিস কেন রে, কমবখত? এ কন্যা তোর ভাগ্যা তো দূরের কথা স্বয়ং ইয়াজিদের ভাগ্যোও জুটবে না।

একথা শুনে ইয়াজিদ রাগান্বিত হয়ে বলল- আপনি মিথ্যে বলছেন। খোদার কসম, আমি যদি চাই, তো মেয়েটিকে গ্রহণ করতে পারি। সাইয়্যিদা যয়নব (রাঃ) বললেন, না, আল্লাহ তোমাকে সে অধিকার দেননি। তুমি তাঁকে পেতে পারনা। ইয়াজিদ গর্জে উঠে বলল- তবে রে- খোদার দুশমন, মিথ্যা বকে যাচ্ছ কেন? যয়ন্ (রাঃ) বললেন তুমি রাজ ক্ষমতার দম্ভে এমন অনুচিৎ কর্কশ ভাষা এবং অশোভন বাক্য প্রয়োগ করছ। এ কথায় ইয়াজিদ কিছুটা লজ্জিত হয়ে নিরুত্তর হয়ে গেল।

মদিনায় প্রত্যাবর্তন ঃ-

দামেস্ক হতে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের সময় আহলে বাইতের সদস্যগণ কারবালা হয়ে মদিনায় আসেন। সেখানে আর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যেও অবতারনা হলো। তাঁরা ইমামের পবিত্র সমাধিতে সালাম আরয করলেন। কাফেলার সকলের কান্নার শোর উচ্চকিত হয়ে যেন কেয়ামতের চিত্র উদ্ভাসিত হল। এক রাত তাঁরা সেখানে অতিবাহিত করলেন- ফাতেহাখানি ও যিকির তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন।

৬১ হিজরীতে আশুরার দিনে সংঘটিত কারবালার নৃশংস ও হৃদয় বিদারক ঘটনার বিবরণ শুনলে কিছুটা হলেও অনুভব করা যায় যে- বাতিল ও নিষ্ঠুর কিছু দুনিয়ালোভী স্বার্থপরদেও কারণে নবীবংশের উপর দিয়ে কত বড় বিপদ বয়ে গেছে- অথচ তাঁরা পরম ধৈর্যের সাথে সত্যেও পথে অবিচল ছিলেন।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানাই শহীদানে কারবালা ও আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) উপর। আমরা সবাই যেন সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শহীদানে কারবালা ও আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) গণের অনুসরনের কুণ্ঠাবোধ না করি।

www.sunniberta.com

আল কুরআনের জীবন্ত কাহিনী

মাওলানা কারামত আলী নিযামী

চারটি পাখি

হযরত ইবরাহিম (আঃ) ছিলেন স্বভাব সুলভ দার্শনিক। কোন বস্তুর মুলতত্ত্ব আবিস্কার ও উদঘাটনে তার ছিল প্রকৃতিগত প্রবণতা। প্রত্যেকটি বস্তুর মূল তত্ত্ব পর্যন্ত উপনীত হওয়া এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর যথার্থ বিশ্বাস পোষণ করতে পারেন।

পিতা আজর, সম্প্রদায়ের লোকজন এবং নমরুদের সাথে তার বিতর্ক দ্বারা তারা স্বভাব সুলভ বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি মৃত্যুও পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্তোষ জনক বিশ্বাস লাভের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট জানতে চাইলেন যে তিনি মৃত প্রাণীকে কিভাবে পুণর্জীবন দান করবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আঃ) বললেন হে ইবরাহীম ! তুমি কি এ বিষয় সন্দেহ পোষন করছ? এ ব্যাপারে কি তোমার অন্তরে ইমান নেই? তখন তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জওয়াব দিলেন এ বিষয় আমার অনঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আপনি মৃতকে পুণর্জীবন দান করতে পারেন। আমার এ বিশ্বাসের মধ্যে বিন্দু বরাবর ফাটল নেই। কিন্তু আমার এ বিষয় জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার বিশ্বাসকে চুড়ান্ত পর্যায়ে শক্তিশালী করা অর্থাৎ হাক্কুল ইয়াকীনের মর্যাদায় উন্নীত করা। আমার আশা হল আপনি আমাকে চাক্ষুষ ভাবে দেখাবেন - যে মৃত্যুর পর আপনি কিভাবে পুনর্জীবন দান করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি চার প্রকারের চারটি পাখি এনে জবাহ্ করে ওদের মাংসগুলো গড়িয়ে তোমার সম্মুখের চারটি পাহাড়ে রাখ। অুঃপর প্রত্যেক পাখীর নাম ধরে ডাক। তখন দেখতে পাবে তারা তোমার কাছে উড়ে আসছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার কথামত চার প্রকার চারটি পাখি জবাহ্ করে তাদের মাংসগুলো টুকরা টুকরা করতঃ গড়িয়ে চারটি পাহাড়ে রেখে আসলেন। অুঃপর ওদের নাম ধরে ডাকলে ওরা পরপর তার কাছে উড়ে আসল। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান সম্পর্কে মনের বদ্ধমুল বিশ্বাসটি চুড়ান্ত পর্যায়ে প্রবল শক্তি শালী হল। এ ঘটনাটিকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মজীদে নিম্ন রূপ ভাষায় বর্ননা করেছেন ঃ-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (২৬০)

" যখন ইবরাহীম (আঃ) বলল, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন তাহলে তুমি কি এ ব্যাপারে ঈমান আননি। তখন সে বলল এই বিষয় আমি আবশ্যই ঈমান রাখি।কিন্তু আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য উহা আমি চাক্ষুস দেখতে চাই। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, চারটি পাখি আন এবং ওদেরকে জবাহ্ করে টুকরা টুকরা কর অতঃপর ঐ মাংসগুলোর এক একটি অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে এস অতঃপর ওদেরকে ডাক দাও। ওরা (স্বতস্ফুর্ত ভাবে জীবিত হয়ে) দ্রুত গতিতে তোমার নিকট চলে আসবে। তুমি জেনে রাখ যে আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । (সূরা বাকারাহ - ২৬০)

উপদেশঃ-

(১) উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার কাছে মৃতকে পুনরায় কিভাবে জিবিত করবেন তা চাক্ষুষ ভাবে অবহিত হতে পেরেছিলেন। তার মনে বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে নয়। আল্লাহ তায়ালা অহীর ইলম দ্বারা তিনি মন বদ্ধমুল ভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পুরামাত্রায় ক্ষমতাবান। এর পরও জানতে চাওয়ার কারণ হল চাক্ষুষ ঘটনা অবলোকন করে নিজের মনকে প্রশান্ত করা। কোন বিষয়ে মন প্রশান্ত হলে সে বিষয়ে বিশ্বাসটি চুড়ান্ত পর্যায়ে স্থাপিত হয়।

(২) এ ঘটনা দ্বারা আর এক তত্ত্ব উদঘাটিত হয় যে মানুষের অন্তঃকরণে যে বিশ্বাস পোষণ করা হয় সে বিশ্বাসটির তিনটি স্তর রয়েছে প্রথম হচ্ছে ইলমুল ইয়াকীন বা জ্ঞান ও বিদ্যাহত বিশ্বাস। পুথিগত বিদ্যা বা শ্রবণগত বিদ্যার দ্বারা মানুষের মনে যে বিশ্বাস জন্মলাভ করে তাকে ইলমুল ইয়াকীন বলা হয়। যেমন কোন

লোক ভূগোলের বিদ্যা অর্জন করে জানল যে ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয় পর্বত অবস্থিত। এ বিদ্যার ভিত্তিতেই তার মনে হিমালয় পর্বত সম্পর্কে একটি বিশ্বাস। অর্থাৎ কোন বস্তু চাক্ষুস দর্শন করার পর সেই বস্তু সম্পর্কে যে বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি হয় তাকে আইনুল ইয়াকীন বলে। যেমন কোন ব্যক্তী হিমালয় পর্বতের পাদদেশে দন্ডায়মান হয়ে সে পর্বত সম্পর্কে তার মনে একটি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হল এ বিশ্বাস কখনো বিলীন হয় না। এই প্রকার বিশ্বাসের নাম হল আইনুল ইয়াকীন। তৃতীয় হচ্ছে হাক্কুল ইয়াকীন বা ব্যবহারগত বিশ্বাস - অর্থাৎ কোন বস্তু ব্যবহার করার পর সে সম্পর্কে মনে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় তাকে হক্কুল ইয়াকীন বলা হয়, যেমন কোন ব্যক্তি হিমালয় পর্বতে আরোহণ করে কিছু দিন অবস্থান করল এবং তথাকরা জিনিষ ব্যবহার করল। এহেন ব্যবহারিক অবস্থার পরিণতিতে তার মনে হিমালয় সম্পর্কে যেই বিশ্বাস সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে চিরন্তন বিশ্বাস। এ বিশ্বাস কোন কিছুতেই বিলীন করতে পারে না।এটাই হচ্ছে চিরন্তর বিশ্বাস। এ বিশ্বাস কিছুতেই বিলীন করতে পারে না। এটাই হচ্ছে বিশ্বাসের উন্নততম স্তর। উপরোক্ত ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আ:) নিজের মনে মৃতকে পুনর্জীবন দান করা সম্পর্কে এহেন আইনুল ইয়াকীন ও হক্কুল ইয়াকীন লাভ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য অবলোকন করতে চেয়েছিলেন।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

-: যোগাযোগ :-
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, ০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী, ০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

সুমাইয়া সার্জিক্যাল

এখানে সকল প্রকার হাসপাতালের মালামাল পাওয়া যায়। ডায়বেটিক, প্রেসার ও ওজন মাপার মেশিন, নেবুলাইজার ডিজিটাল বিপি ও থেরাপি মেশিন, বডি ম্যাসেঞ্জার, জ্বর মাপার থারমোমিটার এবং যাবতীয় সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্ট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

*ঢাকায় মালামাল হোম ডেলিভারি দেয়া হয়।

১৫/২ তোফখানা রোড, বি.এম.এ ভবন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৫২০৪, মোবাইল: ০১৭১১৫৯২৬৫৮, ০১৭১২২৩৫৫১৩

হযরত শাহ জালাল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)-এর সঙ্গী
৩৬০ আউলিয়াদের নামের তালিকা

—— মুহাম্মদ আবুল হাশেম

গত সংখ্যার পর:

২১২) হযরত মোহাম্মদ লতীফ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৩) হযরত মোহাম্মদ সাহাবানী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৪) হযরত মোহাম্মদ হাজী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৫) হযরত মোহাম্মদ সিকন্দর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৬) হযরত মোহাম্মদ শাহবাল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৭) হযরত মোহাম্মদ শূজা (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৮) হযরত মোহাম্মদ নকী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২১৯) হযরত মোহাম্মদ কাবেরী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২০) হযরত মোহাম্মদ দরিয়া (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২১) হযরত মোহাম্মদ মিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২২) হযরত মোহাম্মদ সৈয়দ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৩) হযরত মাওলানা কেয়াম উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৪) হযরত মখদুম হাবিব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৫) হযরত মখদুম রহীম উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৬) হযরত মখদুম নিজামউদ্দিন সেমানী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৭) হযরত মখদুম জাফর গজনবী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৮) হযরত মদসুদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২২৯) হযরত মসউদ মূলক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩০) হযরত মহিউদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩১) হযরত মহিন আলী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩২) হযরত মওদোদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৩) হযরত মারুফ সেলদার (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৪) হযরত বুরহান উদ্দিন বুরহান (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৫) হযরত বুরহান উদ্দিন আহম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৬) হযরত বুরহান উদ্দিন কাত্তাল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৭) হযরত বদর মূলক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৮) হযরত দায়দ মূলক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৩৯) হযরত তাজ মূলক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪০) হযরত জয়েন উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪১) হযরত জয়েন উদ্দিন আনসারী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪২) হযরত জয়েন উদ্দিন মোহাম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৩) হযরত জিয়া উল্লাহ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৪) হযরত জিন্দা পীর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৫) হযরত জুনেদ গুজরাটী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৬) হযরত ইসমাইল ওমরী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৭) হযরত ইসা চিশতী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৮) হযরত ইমাম উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৪৯) হযরত এতিম শাহ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫০) হযরত কারী এমিয়া (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫১) হযরত ওসমান উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫২) হযরত ওসমান উদ্দিন ২য় (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৩) হযরত ওমর দরিয়া (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৪) হযরত করিম দাদ রুমী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৫) হযরত কামাল উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৬) হযরত কালা মিয়া (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৭) হযরত কুতুব আলম (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৮) হযরত কাসিম বন্দেগী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৫৯) হযরত গরীব খাকী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬০) হযরত গনী মোহাম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬১) হযরত গয়বী পীর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬২) হযরত গোলাম (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৩) হযরত দিলওয়ার খতীব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৪) হযরত দাওর বখস খতীব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৫) হযরত দাদা পীর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৬) হযরত দৌলত গনী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৭) হযরত দৌলত গাজী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৮) হযরত দৌলত মানিরী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৬৯) হযরত নূর মূলক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭০) হযরত নূর উল্লাহ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭১) হযরত নূরুল হুদা (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭২) হযরত নূর আলী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৩) হযরত নিজাম উদ্দিন কেরমানী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৪) হযরত নিজাম উদ্দিন বাগদাদী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৫) হযরত পীর আমিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৬) হযরত পীর মূলক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৭) হযরত জীয়াউদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৮) হযরত পীর পাঞ্জাতন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৭৯) হযরত পীর পাঞ্জাতন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮০) হযরত পীর পাঞ্জাতন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮১) হযরত পীর পাঞ্জাতন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮২) হযরত পর্বত গান পীর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৩) হযরত ফরিদ আনসারী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৪) হযরত রওশন চেরাগ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৫) হযরত ফতেহ গাজী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৬) হযরত ফিরোজ আতাবী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৭) হযরত ফরো জয়েদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৮) হযরত দেওয়ান পতেহ মোহাম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৮৯) হযরত আহমদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯০) হযরত খান্ডা ঝকমক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯১) হযরত তিন সালামী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯২) হযরত ব-আবুদৌলত (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯৩) হযরত বাহার আশকারী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯৪) হযরত রোকন উদ্দিন আনসারী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯৫) হযরত সুলতান শাহ সিকান্দর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯৬) হযরত সিকান্দর তবলিয়াজ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯৭) হযরত সোনা গাজী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
২৯৮) হযরত সাহাব উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)

২৯৯) হযরত মালেহ মালেক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০০) হযরত সিকন্দর সলিম (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০১) হযরত লাল সাহেব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০২) হযরত উল্লাহ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৩) হযরত হবিব গাজী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৪) হযরত হাফিজ মোহাম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৫) হযরত হেলিম উদ্দিন নূরনালী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৬) হযরত হামিদ ফারুকী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৭) হযরত হায়দর গাজী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৮) হযরত হাশেম চিশতি (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩০৯) হযরত হজ্জত মালেক (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১০) হযরত হুসামউদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১১) হযরত হিসান উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১২) হযরত হাসান শহীদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৩) হযরত হাফেজ ফসী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৪) হযরত গোলাম ২য় (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৫) হযরত সূফি হোসেন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৬) হযরত দেওয়ান খলিল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৭) হযরত হাজী জমসের খতীব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৮) হযরত শেখ নসর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩১৯) হযরত মকদুম সাহেব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২০) হযরত কাজী শাহ দেওয়ান (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২১) হযরত শরীফ আজমীরি (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২২) হযরত লাল সাহেব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৩) হযরত সূফি হোসেন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৪) হযরত মাদ সৈয়দ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৫) হযরত গরম দেওয়ান (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৬) হযরত মোকদার শহীদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৭) হযরত শামস উদ্দিন বিহারী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৮) হযরত দরিয়া পীর (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩২৯) হযরত সৈয়দ বুরুজ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩০) হযরত সৈয়দ উজরান (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩১) হযরত হাসাম উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩২) হযরত হাবুল্লা খতীব (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৩) হযরত মারুফ সিলাদার (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৪) হযরত ফরিদ উদ্দিন রৌশন সিরাজ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৫) হযরত মাওলানা কেয়ামউদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৬) হযরত তাজ মালী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৭) হযরত খাজা পায়ার (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৮) হযরত শেখ বেজ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৩৯) হযরত আদম খাকী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪০) হযরত ইমাম উদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪১) হযরত মোহাম্মদ আইয়ুব ইমাম (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪২) হযরত জামিল (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৩) হযরত হামিদ উদ্দিন নারায়ণ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৪) হযরত জিয়া উদ্দিন আহম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৫) হযরত সৈয়দ আব্দুল করিম (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৬) হযরত গনী আহম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৭) হযরত তৈয়াব সেলামী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৮) হযরত আমিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৪৯) হযরত শেখ শরিফ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৫০) হযরত শাহ গিয়াস আলী (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৫১) হযরত মোহম্মদ নকী বাবুল দৌলত (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৫২) হযরত হাফিজ মোহম্মদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৫৩) হযরত শাহ বাবা মিয়া (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৫৪) হযরত বন্ধু শাহ দাউদ (রহমাতুল্লিল আলাইহি)
৩৫৫) হযরত বাবা আইনুদ্দিন (রহমাতুল্লিল আলাইহি)

(৩৬০ আউলিয়াদের নামের তালিকা পূর্ণ না পাওয়ায় ৩৫৫ জনের তালিকা দেয়া হলো।)

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসুলাল্লাহ [ﷺ]
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম জামে মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা খতীব: উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্য আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র.)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজগুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭